সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

মঙ্গল।

প্রথম পরিচ্ছেদের

অনুবৃত্তি।

ক্ষুদ্র বিষয়ে লোক-মতের ভয়ই উপহাসের ভয়। লোকের মধ্যে একটা সাধারণ রুচি আছে, শোভন অশোভন, সঙ্গত অসঙ্গতের একটা সাধারণ আদর্শ আছে, যাহা লোকের বিচার বুদ্ধিকে সাধারণতঃ পরিচালিত করে—এমন কি, যে পরিহাস, বিচার-বুদ্ধিরই প্রকারান্তর মাত্র সেই পরিহাসের ভাবকেও উদ্দীপিত করে; এবং এই অনুমানের উপরেই, উপহাসের বলবত্তা অধিষ্ঠিত। এই অনুমানটি যদি উঠাইয়া লও, তাহা হইলে, উপহাসের দাঁড়াইবার আর স্থান থাকে না—উপহাসের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিৎ, উচিত অনুচিতের ন্যায় ইহাও অবিনশ্বর।

কোন স্বার্থ ও সুখসাধনের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইলে আমরা একটা কষ্ট অনুভব করি, ইহাকেই পরিতাপ বলে। কিন্তু কোন কুনীতির কার্য্য করিয়া আমাদের মনে যে কষ্ট হয় তাহার সহিত উহার ঐক্য নাই। ইহাও একটা কষ্ট বটে, কিন্তু অন্য প্রকারের কষ্ট। ইহা অনুতাপ, ইহা আত্মগ্লানি। তাহার দৃষ্টান্ত, যখন আমরা কোন বাজির খেলায় হারি তখন তাহা আমাদের নিকট অপ্রীতিকর হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি কোন বাজিতে জিতিয়া মনে মনে জানি যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি প্রতারণা করিয়াছি তখন আমাদের মনে যে কষ্টের ভাব হয় তাহা অন্যরূপ।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট; তাহা হইতেই বৈধরূপে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি যে, যদি ভাল ও মন্দের মধ্যে, পাপ পুণ্যের মধ্যে, স্বার্থমূলক অধর্ম্ম ও নিঃস্বার্থমূলক ধর্ম্মের মধ্যে, একটা স্বরূপগত পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে, মানব-ভাষা ও মানব-ভাষার দ্বারা হৃদয়ের যে ভাবগুলি আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি তৎসমস্তই অর্থহীন হইয়া পড়ে।

এই পার্থক্যের ভিত্তিকে নড়াইয়া দিলে মানব জীবনকে—সমস্ত জনসমাজের ভিত্তিকে নড়াইয়া দেওয়া হয়। এইখানে আর একটা চরম দৃষ্টান্ত—একটা ভীষণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাউক। মনে কর, কোন ব্যক্তি বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। কেন তুমি তাহার প্রাণ হরণ করিবে? ভাল মন্দের মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই ইহাই যাহাদের মত তাহাদের স্থানে তুমি আপনাকে একবার স্থাপন কর, এবং এই মানব-বিচার-নির্দ্ধারিত দণ্ডের মধ্যে যে মূঢ় নৃশংসতা বিদ্যমান তাহাও ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ। অপরাধী কি করিয়াছিল? সে যে কাজ করিয়াছিল তাহাতে আসলে ভাল মন্দ কিছুই নাই। কারণ, যদি ভাল মন্দের মধ্যে, সুখ দুঃখের পার্থক্য ছাড়া আর কোন স্বাভাবিক পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে মানুষের কোন কর্ম্মকেই কি আমরা অপরাধের কোটায় ফেলিতে পারি?—যদি ফেলি, তাহা হইলে কি তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না? কিন্তু আসলে যাহা ভালও নহে, মন্দও নহে,—ব্যবস্থাপ্রণেতা কতকগুলি মনুষ্য তাহাকেই অপরাধ বলিয়া

ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের এই ঘোষণা নিতান্তই একটা খামখেয়ালী ব্যাপার—সুতরাং সেই দণ্ডার্হ ব্যক্তির হৃদয়ে কোন প্রতিধ্বনি হইল না। সে ইহার ন্যায্যতা অনুভব করিতে পারিল না। কারণ সে যে কাজ করিয়াছে আসলে তাহার মধ্যে ন্যায় অন্যায় কিছুই নাই। তাই, যে কাজ যদৃচ্ছাক্রমে অপরাধ বলিয়া পরিঘোষিত হইয়াছে, সেই কাজ করিয়া তাহার অনুতাপও হইল না। জল্লাদ হদ্দ এইটুকু তাহার নিকট সপ্রমান করিবে যে,সে তাহার কার্য্যে সফল হয় নাই, কিন্তু সে যে অন্যায় কাজ করিয়াছে একথা জল্লাদ কখনই সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। কেননা তাহার কাজের মধ্যে ন্যায় অন্যায় কিছুই নাই। জল্লাদ তাহাকে বধ করিল, কি জন্য তাহাকে বধ করিল, বধ্য ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিল না। মৃত্যু দণ্ডই হউক, আর যে কোন দণ্ডই হোক, যদি শুধু আঘাতের দ্বারা আঘাতকে দমন করাই তাহার উদ্দেশ্য না হয়—যদি তাহার উদ্দেশ্য তাহা ছাড়া আর কিছু হয়, তাহা হইলে তাহার মূলে নিম্নলিখিত কয়েকটি তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়,যথাঃ—১ম—ভাল ও মন্দের মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, একটা স্বরূপ-গত পার্থক্য বিদ্যমান, এবং এই পার্থক্য থাকাতেই, বুদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট স্বাধীন জীব মাত্রেই মঙ্গলের পথে ও ন্যায়ের পথে চলিতে বাধ্য। ২য়—এই মনুষ্য বুদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট স্বাধীন জীব,মনুষ্য এই পার্থক্য ও এই দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে,—এবং কৃত্রিম আইন কানুনের অপেক্ষা না করিয়াই আপন ইচ্ছায় স্বাভাবিকভাবে উহাতে অনুরক্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ; তাছাড়া, যে সকল প্রলোভনের প্ররোচনায় মনুষ্য, মন্দের পথে, অন্যায়ের পথে নীত হয়, সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিবার শক্তি—এবং পবিত্র ও স্বাভাবিক ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিবার শক্তিও মনুষ্যের আছে। ৩য়—যে কোন আচরণ ন্যায়ের বিরোধী তাহা বলের দ্বারা দমন-যোগ্য, এবং প্রতিবিধানকল্পে তাহা দণ্ডনীয়, তজ্জন্য কৃত্রিম কোন আইন কানুনের অপেক্ষা রাখে না। ৪র্থ—মনুষ্য, ন্যায় অন্যায়ের মত পাপ পুণ্যেরও পার্থক্য বুঝে, এবং ইহাও বুঝে যে, কোন অন্যায় কর্ম্মের জন্য দণ্ডবিধান করাও সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুগত কার্য্য।

বিচার করিবার শক্তি, দণ্ড বিধানের শক্তি—ইহাই সমাজের ভিত্তি-মূল; ইহাই প্রকৃত সমাজ। স্বকীয় ব্যবহারের জন্য সমাজ, এই সকল নিয়ম, এই সকল মূলসূত্র রচনা করে নাই। এই সকল নিয়ম সমাজ-গঠনের পূর্ব্ববর্ত্তী; মন ও আত্মার প্রথম সূত্রপাত হইতেই উহারা রহিয়াছে,সমাজের সমস্ত নিয়ম ও ব্যবস্থা উহাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল সনাতন মূলসূত্রের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই সামাজিক নিয়মের বৈধতা সম্পাদিত হইয়াছে। শিক্ষা এই সকল নীতিসূত্রকে পরিপুষ্ট করে,—সৃষ্টি করে না।

ব্যবস্থাকর্ত্তা যিনি আইন প্রস্তুত করেন, বিচারকর্ত্তা যিনি এই আইনের প্রয়োগ করেন,—ইঁহারা এই সকল নৈতিক মূলসূত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়েন। যে অপরাধী বিচারের জন্য বিচারালয়ে আনীত হয়, তাহার সম্মুখেও এই সকল মূলসূত্র বিদ্যমান, বিচারকর্ত্তাও এই মূলসূত্র অনুসারেই দণ্ড বিধান করেন। এই মূল সূত্রগুলি উঠাইয়া লও—সমস্ত ন্যায় বিচার বিধ্বস্ত হইবে, এই বিচারকার্য্য কতকগুলা কৃত্রিম নিয়মে পরিণত হইবে; সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কাহারও অনু-

লোপ হইবে না; কেবল দণ্ডের ভয়েই লোকে এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে বিরত হইবে। এই সকল নিয়ম-অনুসারে যে বিচার হইবে, তাহা বিচার নহে,—তাহা অত্যাচার। কর্ত্তব্য ও ন্যায় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সমাজ বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্র হইয়া পড়িবে; ছলে বলে কৌশলে যে যত সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা হইবে—এবং সমস্তের উপর আইনের একটা কপট আবরণ মাত্র থাকিবে। অবশ্য সমাজ ও মানুষের বিচারকার্য্যে এখনও অনেক অসম্পূর্ণতা আছে, কালক্রমে তাহা প্রকাশ পাইয়া সংশোধিত হইবে। কিন্তু এ কথা, সাধারণত বলা যাইতে পারে যে, সমাজ ও মনুষ্যের বিচার-কার্য্য সত্যের উপর ও স্বাভাবিক ন্যায়ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার প্রমাণ, সর্ব্বত্রই সমাজ গঠিত হইয়াছে ও সমাজের ক্রমোন্নতি হইতেছে। তাছাড়া, প্যাস্‌কাল কিংবা রুসো সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যতই বিষাদময় বর্ণে অঙ্কিত করুন না, এ অবস্থা চিরস্থায়ী নহে। প্রত্যক্ষই সব নহে; প্রত্যক্ষ ব্যাপার ছাড়া আরও কিছু আছে,—একটা ন্যায় ধর্ম্মের আদর্শ আছে। ন্যায়ধর্ম্মের যদি একটা বাস্তবিক আদর্শ থাকে, তাহা হইলে সেই আদর্শই দূষিত সমাজ-প্রণালীকে উল্টাইয়া দিবে—মানবের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। এই ন্যায়-ধর্ম্মের আদর্শ কি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক? প্রত্যেক দেশের ভাষাকে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধিকে, সমস্ত মানবজাতিকে আমি সাক্ষী মানিতেছি, প্রত্যক্ষ ব্যাপার ও ন্যায়ের আদর্শ—এই উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে বলিয়া সকলেই কি স্বীকার করে না? কখন কখন বর্ত্তমান অবস্থা, ন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, এবং ন্যায়ের আদর্শও বর্ত্তমান অবস্থাকে শাসন করে,—বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে প্রতিবাদ করে। মনুষ্যসমাজে কোন্ কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শুনা যায়? ন্যায়ের কথাই কি বেশী শুনা যায় না? এমন কোন্ ভাষা আছে যাহাতে ন্যায়শব্দটি নাই? এমন কি, কেহ কেহ ন্যায়কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—এক আইন-ঘটিত কৃত্রিম ন্যায়, আর একটি স্বাভাবিক ন্যায়। ন্যায় কখনই বলের পদানত হইতে পারে না, বলই ন্যায়ের সেবায় নিযুক্ত হইবে, ইহাই সর্ব্বত্র পরিঘোষিত হইয়া থাকে। যখনই অতীতের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, কিংবা কোন দেশে প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ন্যায়ের উপর বলের জয় হইয়াছে, তখনই নিঃস্বার্থ পাঠক কিংবা দর্শকের মনে তীব্র ধিক্কার উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, যে পতাকার গায়ে ন্যায় এই শব্দটি অঙ্কিত থাকে, আমাদের অনুরাগ স্বভাবতই সেই পতাকার দিকেই ধাবিত হয়; সেই অজ্ঞাত পক্ষের ন্যায্য অধিকার সমর্থন করিবার জন্যই আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প হই, ন্যায়ের পক্ষকেই আমরা সমস্ত মানবমণ্ডলীর পক্ষ বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা মনে করি, যতোধর্ম্ম স্ততোজয়। অতএব যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাই সব নহে,—ন্যায়ের ভাব, ন্যায়ের বিশ্বজনীন আদর্শ,—প্রত্যক্ষ জগতে না হউক,—চিন্তা কল্পনার জগতে জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। এই ন্যায়ের আদর্শই প্রত্যক্ষ জগৎকে সংশোধিত করে—পরিশাসিত করে।

এই ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধিকে যখন আমরা সমস্ত মানবজাতির উপর আরোপ করি,—সমস্ত মানবজাতির ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া কল্পনা করি, তখনই উহা সহজ জ্ঞান কিংবা সাধারণ বুদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই সাধারণ সহজবুদ্ধিই সমস্ত দেশের ভাষাকে, স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাসগুলিকে, সমাজকে ও সমাজের মুখ্য ব্যবস্থাগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছে, ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ক্রমশ পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করিতেছে। ভাষাসমূহকে বৈয়াকরণেরা, সমাজকে ব্যবস্থাকর্তারা, কিংবা সাধারণ বিশ্বাসগুলিকে দার্শনিকেরা গড়িয়া তুলে নাই। উহাদিগকে কেহই গড়িয়া তুলে নাই—অথচ সকলেই গড়িয়া তুলিয়াছে; সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর স্বাভাবিক প্রতিভাই উহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধির নিদর্শন, মানুষের তাবৎ কার্য্যেই প্রকাশ পায়। ভাল ও মন্দ, ন্যায় অন্যায়, স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, কর্ত্তব্য ও স্বার্থ, শ্রেয় ও প্রেয়—এই সমস্ত পার্থক্য সমস্ত মানব-ভাষার মধ্যে, সমস্ত মানব ব্যবস্থার মধ্যেই বদ্ধমূল। ধর্ম্মের পুরস্কার সুখ, অপরাধের দণ্ড দুঃখভোগ—ইহাও সকল ভাষাতে, মানুষের সকল ব্যবস্থাতেই মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত ধারণা, মানুষের ভাষায় ও মানুষের কাজে একটু বিশৃঙ্খল ভাবে ও একটু স্থূল ভাবে প্রকাশ পায়।

এইখানেই দর্শনশাস্ত্রের কাজ আরম্ভ হয়। দর্শনশাস্ত্রের সম্মুখে দুইটি পথ প্রসারিত। দর্শনশাস্ত্রকে এই দুই পথের মধ্যে একটি পথ অবলম্বন করিতে হইবে। হয়—সাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধির ধারণাগুলিকে গ্রহণ করা, এবং মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাসগুলিকে যথাযথরূপে বিবৃত করিয়া উহাদিগকে পরিস্ফুট ও সুদৃঢ় করা; নয়,—কোন একটা মূলতত্ত্ব গোড়ায় মানিয়া লইয়া, তাহারই অনুরূপ একটা মতবাদ গঠন করা;—যে সকল সাধারণ বিশ্বাস সেই মূলতত্ত্বের অনুযায়ী হইবে তাহাদিগকে স্বীকার করা এবং তাহার বিপরীতগুলিকে অস্বীকার করা—এইরূপে একটা দর্শনতন্ত্র কিংবা দর্শনের পদ্ধতিবিশেষ গড়িয়া তোলা।

কিন্তু আসলে, কোন দার্শনিক পদ্ধতিই দর্শন নহে; যেমন রাজ্যসংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ, ন্যায়ের আদর্শকে প্রত্যক্ষে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, যেমন শিল্পকলা সমূহ, অসীম সৌন্দর্য্যের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, যেমন বিজ্ঞানসমূহ, বিশ্বজনীন বিজ্ঞানের অনুসরণ করে, সেইরূপ প্রত্যেক দার্শনিক পদ্ধতি কোন আদর্শবিশেষকে প্রত্যক্ষে পরিণত করিবার জন্য প্রয়াস পায়। সুতরাং দার্শনিক পদ্ধতিগুলায় অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী; এই অসম্পূর্ণতা না থাকিলে, জগতে একটি বই দুইটি দর্শনশাস্ত্র থাকিত না। তাহারাই ভাগ্যবান যাহারা দর্শনের কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, কতকগুলি নিরীহ-ধরণের ভ্রমে পতিত হইয়াও, প্রত্যেক মানবের অন্তরে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের পবিত্র রসাস্বাদনের একটা রুচি জন্মাইয়া দেয়! কিন্তু দার্শনিক পদ্ধতিগুলা প্রায়ই নিজ নিজ কালেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে,—কালকে নূতন পথে লইয়া যায় না। যে দর্শনতন্ত্র যে শতাব্দিতে উৎপন্ন হয়, সেই দর্শনতন্ত্র সেই শতাব্দিরই ভাব গ্রহণ করে। এই কালধর্ম্মের প্রভাবেই আমাদের দেশে স্বার্থমূলক নীতিতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা এক্ষণে সেই নীতিতন্ত্রের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইব।

ঈথার।

মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সুগঠিত হইলেও, তাহাদের শক্তি এত সঙ্কীর্ণ যে, কেবলমাত্র

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞানের কোন কাজ করা চলে না। অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত নক্ষত্রগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা এককালে তিন হাজারের অধিক তারকা দেখিতে পাই না। কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিলে সংখ্যা বাড়িয়া যায়। দূরবীন্ দ্বারা আকাশের ফটোগ্রাফ গ্রহণ কর,—দেখিবে যেস্থান দূরবীনেও তারকাশূন্য দেখাইয়াছিল সেখানে শত শত নক্ষত্রের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আকাশের যে স্থানকে চক্ষু নক্ষত্রহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করে, দূরবীন্ সেখানে সহস্র সহস্র নক্ষত্র দেখায়, এবং দূরবীন্ও যেখানে নক্ষত্র দেখাইতে পারে না, ফোটোগ্রাফের যন্ত্র সেখানে শত শত নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে।

মানুষের দৃষ্টিশক্তি যে কত দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ এই ক্ষুদ্র উদাহরণে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কেবল দৃষ্টিশক্তির নয়, স্বাদ গন্ধ ও স্পর্শ উপলব্ধিরও অসম্পূর্ণতা আছে এবং সকল শক্তির এক একটা সীমা ধরা পড়িয়াছে। এই সীমার বাহিরে গেলে, মানুষ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ও সচেতন জীব হইয়াও জড়বৎ কার্য্য করে। তখন স্বাদগন্ধস্পর্শ ইন্দ্রিয়দ্বারে শত আঘাত দিয়াও সাড়া পায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কেবল এই সকল অসম্পূর্ণ ও দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের আলোচনা করা চলে না। কাজেই জড় বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইলেও কতকগুলি অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিয়া লইয়া, তাহাদিগকে কখন কখন বিজ্ঞানে স্থান দিতে হয়।

পদার্থমাত্রই অণুদ্বারা গঠিত, এবং প্রত্যেক অণু আবার দুই বা ততোধিক পরমাণুর সমষ্টি। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও অদ্যাপি এই সকল অণুপরমাণুর খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহাদের যে অস্তিত্ব আছে রসায়নশাস্ত্রে তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান, এবং এই অস্তিত্ব মানিয়াই রসায়নশাস্ত্রের খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারেরই সুব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অণুপরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইতেছে।

ঈথার জিনিসটা ঐ অণুপরমাণুর ন্যায়ই একপ্রকার অতীন্দ্রিয় পদার্থ। তাপ আলোক বিদ্যুৎ ও চুম্বক প্রভৃতির নানা শক্তির পরীক্ষা করিয়া, এই পদার্থের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে, এবং ইহাকেই মানিয়া লইয়া জড়তত্ত্বের নানা কঠোর সমস্যার সুমীমাংসা হইতেছে। সুতরাং ঈথারের-অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোন কারণই নাই।

এখন ঈথারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈথার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস নয়। সুতরাং ইহার বর্ণ ও গন্ধাদি সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমরা ইহার কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের সহিতই পরিচিত। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, অনন্ত মহাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহ উপগ্রহ মৃৎপিণ্ড ও বালুকণা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ পদার্থমাত্রেরই অধিকৃত স্থান ঈথারে পূর্ণ। ধাতুপিণ্ডের অণুসকল খুব নিবিড়ভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ, কিন্তু তথাপি ইহার অণুগুলির মধ্যে যে অতিসূক্ষ্ম অবকাশ আছে, তাহা ঈথারে পূর্ণ। ধূলিকণা যখন বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন যেমন প্রত্যেক কণারই চারিদিকে বায়ু ঘেরিয়া থাকে, তরল কঠিন ও বায়বীয় সকল পদার্থেরই প্রত্যেক অণুর চারিদিকে সেইপ্রকার ঈথার ঘেরিয়া রহিয়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল

উপরে বায়ুর অস্তিত্ব প্রায় লোপ হইয়া যায়, কিন্তু জগদীশ্বর অনন্ত দূরবর্ত্তী কোটি কোটি নক্ষত্রেরও চারিদিকে ঈথারকে চিরব্যাপ্ত করিয়াছেন।

কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না। কাচের আবরণের ভিতর একটি ঘড়ি রাখ। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই যদি আবরণের ভিতরকার বায়ু নিষ্কাশিত করা যায়, তখন ঘড়ির শব্দ আর মোটেই কর্ণে আসিবে না। এই সামান্য পরীক্ষাদ্বারা বায়ুই যে শব্দবহনের কারণ তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এখন বায়ুশূন্য পাত্রের পশ্চাতে একটি দীপ-শিখা রাখিয়া সম্মুখ হইতে শিখার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দীপের আলোক কাচের বাধা অতিক্রম করিয়া এবং বায়ুহীন পাত্রের ভিতর দিয়া অবাধে আসিয়া চোখে পড়িবে। বায়ুর অভাবে শব্দের চলাচল যেমন বন্ধ হইয়াছিল, আলোকের গতায়াত তাহাতে মোটেই অবরুদ্ধ হইল না।

এই দুইটি পরীক্ষার কথা ভাবিলে শব্দ-বহ বায়ুর ন্যায় আলোকবহ কোন এক-প্রকার জিনিসের কথা স্বতঃই আমাদের মনে পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ ঈথার-কেই সেই আলোকবহ পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদার্থ যতই ঘন হউক না কেন, তাহার ঘন-বিন্যস্ত অণুগুলির মধ্যে এক একটু ব্যবধান সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। কোন পদার্থেরই অণু পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া থাকে না। এখন যদি এইপ্রকার বিচ্ছিন্ন অণুময় কোন পদার্থের একপ্রান্তে তাপ বা বিদ্যুৎ প্রয়োগ করা যায়, তবে তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিত হইয়া শীঘ্রই অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে বায়ুর তাপ বা বিদ্যুৎকে কে পরিবাহন করে? ইহা কোনক্রমে বায়ুর কার্য্য হইতে পারে না। কারণ বায়ুহীন স্থানে বিদ্যুৎ ও তাপের পরিবাহন পূর্ণমাত্রাতেই চলিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ এক ঈথারকেই তাপ ও বিদ্যুৎ উভয়েরই পরিবাহক বলিয়া স্থির করিয়া-ছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে ঈথার যে কেবল সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা নয়, বায়ু যেমন শব্দের পরিবাহক ঈথার জিনিসটা সেই প্রকার তাপ আলোক বিদ্যুৎ এই তিনেরই পরিবাহক।

এখন পরিবাহনকার্য্য কিপ্রকারে চলে দেখা যাউক। স্থির জলের কোন অংশ আলোড়িত করিলে, আলোড়ন একস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। আহত অণুগুলি উঠিয়া নামিয়া পার্শ্বস্থ অণুগুলিতে সেই আলোড়ন সঞ্চারিত করে, এবং এই ধারায় তাহা তরঙ্গাকার প্রাপ্ত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইপ্রকার তরঙ্গ উৎপাদন করিতে অণুগুলি স্থানচ্যুত হয় না। কেবল কিয়ৎকালের জন্য উপরনীচে আন্দোলিত হইয়া এবং এই আন্দোলন-বেগ পার্শ্বস্থ অণুতে সঞ্চারিত করিয়া সেগুলি ক্রমে স্থির হইয়া পড়ে। তরঙ্গে ভাসমান কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, জলের অণুগুলির এই কার্য্য বুঝা যায়। ভাসমান জিনিস তরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া যায় না, একই স্থানে থাকিয়া আন্দোলিত অণুগুলির সহিত উপরনীচে উঠিতে নামিতে থাকে মাত্র। পরিবাহন কার্য্যটা ঈথার জলের ন্যায়ই করে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহার কোন এক অংশ তাপ আলোক বা বিদ্যু-তের দ্বারা স্পন্দিত হইলে, সেই স্পন্দন তাহার অণুপরম্পরায় পরিবাহিত হইয়া অতি দ্রুতবেগে বহুদূরে পরিচালিত হয়। তরঙ্গ পরিচালনে জলের অণু যেমন স্থানভ্রষ্ট হয় না, এখানে ঈথারের অণুরও সেইরূপ স্থান-

চ্যুতি ঘটে না। একটু এদিক্-ওদিক্ কাঁপিয়া এবং সেই কম্পন পার্শ্বস্থ অণুতে সঞ্চারিত করিয়া ঈথারের প্রত্যেক অণুই স্থির হইয়া যায়।

আলোড়নের মাত্রার তারতম্য হইলে সঙ্গে সঙ্গে জলতরঙ্গের উচ্চতারও তারতম্য আসিয়া পড়ে। ঈথারসাগরে যে সকল তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহাদেরও ঐ প্রকার বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে। এই বিচিত্র তরঙ্গমালাই আমাদের নানা ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়া, তাপালোক ও বিদ্যুতের নানা কার্য্য দেখায় বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ঈথরের তরঙ্গ একটা নিছক্ কল্পনার জিনিস বলিয়া কেহ মনে না করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সুকৌশলে নানা প্রকার ঈথর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য পর্য্যন্ত পরিমাপ করিয়াছেন। হিসাবে দেখা গিয়াছে, এক ইঞ্চিকে চল্লিশ হাজার সমান অংশে ভাগ করিয়া, তাহার এক অংশ লইলে যে একটু অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, সেই দৈর্ঘ্যের ঈথর-তরঙ্গ আমাদের চক্ষে আসিয়া আঘাত দিলে আমরা লোহিতালোক দেখিতে পাই, এবং দৈর্ঘ্য ক্রমে কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া দাঁড়াইলে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ক্রমে হলুদ, সবুজ ও বেগুণিয়া প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তি হয়। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ঈথরতরঙ্গগুলি দ্বারা যে কি কার্য্য হয়, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় তাহা বুঝিতে পারে না। তরঙ্গের কম্পন ধীরতর হইতে হইতে যখন প্রতি সেকেণ্ডে একশতবার হইয়া দাঁড়ায়, তখন উহা আবার আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। এই অবস্থায় ঈথরতরঙ্গ আলোকজ্ঞান উৎপন্ন করায় না, ইন্দ্রিয় দ্বারে আঘাত দিয়া তাপাকার পরিগ্রহ করে।

হারমোনিয়মের এক একটা পরদাকে বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের এক একটা ঈথরতরঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। সঙ্গীতবিৎ হারমোনিয়মের কয়েকটি মাত্র সপ্তকের পরদা নাড়া চাড়া করিয়া থাকেন। এই সীমার উপর নীচে গেলে পরদার সুর এত মিহি ও এত মোটা হইয়া পড়ে যে তখন সেই সকল সুরে আর সঙ্গীতের কাজ চলে না। সরুমোটার পরিমাণ আরো বাড়িয়া গেলে সেগুলি কর্ণে পৌঁছিয়া শব্দ-জ্ঞান পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারে না। ঈথর-তরঙ্গের পরদাগুলিরও অবস্থা কতকটা সেই প্রকার। ইহার কেবল এক সপ্তকের পরদার সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে। ইহাই সেই লোহিত পীতাদি সাত সুরের পরদা। এগুলি অপেক্ষা যে তরঙ্গগুলি দীর্ঘতর বা ক্ষুদ্রতর তাহাদের কার্য্য কি তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের জানা ছিল না। ক্রমে এগুলির বিশেষ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে। X-Rays নামক অদৃশ্য কিরণের কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইহা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঈথর তরঙ্গেরই ফল বলিয়া জানা গিয়াছে, এবং যেগুলির দৈর্ঘ্য তাপোৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষাও বৃহত্তর তদ্দ্বারা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উৎপত্তি দেখা গিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (Clerk Maxwell) অনুমান করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ আলোক ও বিদ্যুৎ উভয়ই ঈথার তরঙ্গদ্বারা উৎপন্ন। দৈর্ঘ্যের তারতম্যেই সেগুলি কখন আলোক এবং কখন তাপ বা বিদ্যুৎ আকারে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। ম্যাক্সওয়েল জীবনকালে এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করিবার সুযোগ পান নাই। তাপালোক ও বিদ্যুৎ সকলই যে ঈথার তরঙ্গেরই কার্য্য,

পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ তাহা সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আলোক ও বিদ্যুৎ উভয়েই প্রতিসেকেণ্ডে একশত পঁচাশি হাজার মাইল বেগে পরিচালিত হয়। আলোকরেখা যে নিয়মে দিক্ পরিবর্ত্তন করে ও প্রতিফলিত হয়, ঈথার তরঙ্গের প্রতিফলনাদিতেও জর্ম্মানপণ্ডিত হার্জসাহেব, এবং আমাদের স্বদেশবাসী মহা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অবিকল সেই সকল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তাপালোক ও বিদ্যুৎ সকলই এক ঈথারেরই নানাপ্রকার তরঙ্গদ্বারা উৎপন্ন হইলে, তাহাদের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলির মধ্যে এত অনৈক্য কোথা হইতে আসে? ধাতুর সূক্ষ্ম পাত আলোকপথে ধরিলে, আলোক বাধা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে না, কিন্তু তাপ ও বিদ্যুৎ উভয়েই বাধা অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। যে জিনিস তাপের পথ রোধ করে তাহাই আবার অনেক সময়ে আলোককে অবাধে চলিতে দেয়। আলোক সর্ব্বদাই একসরল রেখা-ক্রমে চলে, কিন্তু বিদ্যুৎকে অনেক সময় আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে দেখা যায়। এই সকল অনৈক্যের কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন কোন পদার্থ দ্বারা আলোক এক-বারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ঈথরের অভাবকে কখনই ইহার কারণ বলা যায় না। ঈথর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। সুতরাং কোন স্থানেই ঈথরের অভাব নাই। ঈথরের তরঙ্গ বিশেষকে বাধা দেওয়া বা অবাধে চলিতে দেওয়া পদার্থের অণুগুলিরই বিশেষ ধর্ম্ম। কাচের অণুগুলির প্রভাবে তাহাদের চারি-পার্শ্বের ঈথরের অবস্থা এপ্রকার হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাতে কেবল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হইতে পারে। কাজেই কাচের ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি অবাধে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু যে সকল বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ দ্বারা বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, তাহা ঐ আবদ্ধ ঈথরে উৎপন্ন হইতে পারে না। কাজেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ কাচের ভিতর দিয়া অবাধে চলে না। ধাতুর অণু-গুলির ব্যবধানস্থিত ঈথার ক্ষুদ্র তরঙ্গাকারে কাঁপিতে পারে না। এজন্য ধাতু মাত্রেই অস্বচ্ছ। কিন্তু তাপ ও বিদ্যুতের বড় বড় তরঙ্গগুলি সেই ঈথরকেই কাঁপাইয়া অনা-য়াসে বাহিরে আসিতে পারে।

পদার্থের অণু কি প্রকারে আবদ্ধস্থানের ঈথরে পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার গুণ উৎপন্ন করে তাহা আজও জানা যায় নাই, এবং অণুর প্রভাবব্যতীত অপর কোনও কারণে ঈথর ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইতে পারে কি না তাহারও স্থিরতা নাই। বিধাতার অনন্ত সৃষ্টির নানা প্রহেলিকার মধ্যে এটা যে আজও রহস্যযবনিকার অন্তরালে রহিয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বিদ্যুতের সহিত চুম্বকধর্ম্মের একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। ঈথরের স্পন্দন বিশেষই পদার্থকে চুম্বকধর্ম্মী করে, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লর্ড কেল্-ভিন্ ও জর্ম্মান্ পণ্ডিত হেলম্‌হোজ্ ঈথরের আরো অনেক নব নব ধর্ম্মের কথা বলিয়া-ছেন। প্রাথমিক জড়ের উৎপত্তি কিপ্রকারে হইয়াছিল, এবং কি প্রকারে জড়পদার্থমাত্রই আকর্ষণ বিকর্ষণের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, প্রাচীন ও আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিকই তাহার আভাসপর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। মূল জড়কণা ঈথরেরই আবর্ত্ত বিশেষ দ্বারা উৎ-পন্ন হয় বলিয়া লর্ড কেল্‌ভিনের বিশ্বাস হইয়াছিল, এবং ইহার আকর্ষণ বিকর্ষণও ঈথরের কাজ বলিয়া তিনি অনুমান করি-য়াছিলেন। এই সকল অনুমানের সমূলকতা প্রতিপাদনের জন্য লর্ড কেল্‌ভিন্ ও হেলম্-হোজ্ উভয়েই কিছুকাল চেষ্টা করিয়াছি-লেন। কিন্তু অদ্যাপি এই অনুমানগুলিকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই।

ধ্রুবতারা।

ভ্রান্তনর! বৃথা কেন কর অহঙ্কার,
সংসার তিমির মাঝে না পাবে নিস্তার,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট তুমি নর—ধ্রুবতারা ওহে,
হেথা নহে—হেথা নহে বহুদূরে রহে;

অন্ধকার নাহি সেথা শুধু জ্ঞানালোক,
সন্তাপ, সংশয় নাহি জরা, মৃত্যু, শোক,
অনাদি জোৎস্না এক সদা পরকাশ,
নাহি বহে কালনদী, নাহি নীলাকাশ;
অগণ্য অমর জ্যোতি একেতে পশিয়া,
শোভিতেছে নিরবধি অনন্তে ফুটিয়া;
তথায় তোমার গতি, মরণের পরে,
মর্ত্ত্য ছাড়ি যেতে হবে মহান ঈশ্বরে;
ত্যজ দম্ভ, ত্যজ দ্বেষ, তাঁহাতে নির্ভর,
জনম মরণ স্থিতি যাঁতে নিরন্তর।
সংসার বন্ধন তব মোহের বন্ধন,
বিপাকে ফেলিছে নিত্য, ঘোর নিবন্ধন,
তাহাতেই আছ লিপ্ত তুমি মূঢ় নর,
ক্ষণেকেও নাহি ভাব ব্রহ্ম পরাৎপর,
দাও ঢালি তব প্রাণ তাঁহার চরণে,
পাইবে পরম সুখ জীবনে মরণে।

শ্রীপৃথ্বীনাথ শাস্ত্রী।

নানা কথা।

অহিফেন নির্ব্বাসন।—Friend of China অর্থাৎ চীনবন্ধু নামক সংবাদপত্রে চীন-অহিফেনসেবির ধূমপানের যন্ত্রাদি দাহনের একটি সুন্দর চিত্র বাহির হইয়াছে। বিগত সেপ্টেম্বর মাহার শেষে চীনের Hangchow হ্যাংচ নামক স্থানের সিটি-হলে প্রায় বিংশ সহস্র চীনদেশস্থ ধূমপায়ী তাহাদের ধূমপানের নল ও অন্যান্য উপকরণ রাশীকৃত করে। ঐ রাশির ভূপদেশ ছয় ফিট ও উচ্চতা সাত ফিট হইয়াছিল। তৈলমিশ্রিত তৃণযোগে নির্দ্ধারিত সময়ে সকলের সমক্ষে উহাতে অগ্নিদান করা হয়। তাহাদের উল্লাস ও কলরবের মধ্যে অচিরে ঐ স্তূপ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। আমরা উক্ত পত্রিকা সম্পাদকের ভাষায় বলিতেছি "যে সকল চীন-অহিফেনসেবী অহিফেনের সহিত এরূপ তীব্র সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর এবং যে সকল রাজকর্ম্মচারী অহিফেন-বন্ধন হইতে প্রজাগণকে বিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য ঈশ্বরের অমোঘ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর।" চীন জাগিতেছে। ভারতেরও ঘোর মহানিদ্রার মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। এ শুভক্ষণে মতভেদজনিত অন্তর্বিবাদ অঙ্কুরের মুখেই বিনষ্ট হউক; সমবেত চেষ্টা সকলের কার্য্যে ও অনুষ্ঠানে অবতীর্ণ হউক; ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।—২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখের Indian messenger পত্র সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে "বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত ঋষি-ভাবের আদর্শ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ; তাঁহার জীবনের আদর্শই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ। তাঁহার সমুন্নত জীবনের ভাবকে আমাদের মধ্যে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।"

একেশ্বরবাদ।—২৫এ জানুয়ারি তারিখের Christian life নামক বিলাতীয় সংবাদ পত্রে আছে, ১৮৩০। ২৩এ জানুয়ারি তারিখে মনিষী রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে British and Foreign Unitarian association একেশ্বরবাদ-সভা ইংলণ্ডে সমুদ্ভূত হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দুই সভার মধ্যে মতে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। ইতিহাসের দিক দিয়া বলিতে গেলে বিগত শতাব্দিতে ভারতীয় একেশ্বরবাদের প্রভাব বিলাতে পরিলক্ষিত হয়। রেভাঃ W. Adam আডাম সাহেব ত্রিত্ববাদ পরিহার করিয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন এবং সকলের নিকট Second Fallen Adam দ্বিতীয় পতিত আদম বলিয়া পরিচিত হয়েন। রামমোহন রায়ের শক্তি আডাম সাহেবের ভিতরে কার্য্য করিয়াছিল এবং তিনিই এডাম সাহেবের মতপরিবর্ত্তনের কারণ ছিলেন। এডামের মত পরিবর্ত্তন ১৮২১ খৃঃ অব্দে ঘটে, এবং ১৮২৩ সালে Unitarian association একেশ্বরবাদ-সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিজন সাহেব এবং তিনজন ভারতবাসী প্রথমে উহার সভ্য হন। ঐ সভা বহুদিন স্থায়ী না হইলেও ব্রাহ্মসমাজ উহারই স্থান অধিকার করিয়া লয়। সে আজ ৭৮ বৎসরের কথা।

ব্রাহ্মসম্মিলন।—বিগত ১১ই ফাল্গুন ৭নং বজবজ রোডস্থিত মহারাজা ময়ূরভঞ্জের উদ্যানে তিন সমাজের ব্রাহ্মগণের দিবসব্যাপী সম্মিলন হইয়াছিল। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম তথায় উপস্থিত ছিলেন। এরূপ সম্মিলনের যে বিশেষ উপকারিতা আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সপ্তম-শতাব্দির ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের অধ্যক্ষ Rev. J. Estlin Carpenter, Leeds লিড্‌স নগরে "সপ্তমশতাব্দির ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দান করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার মূলে আভাস দেন যে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপরে যতদিন না ইংলণ্ড প্রকৃত মর্য্যাদা দান করিতে শিক্ষা করিবেন, ততদিন ইংলণ্ড হইতে বর্ত্তমান ভারতের ন্যায়বিচারের আশা নাই। চীনদেশীয় পরিব্রাজক Yuan Chwang হিয়ান সাং ভারত ভ্রমণে আসিয়া পাটনার দক্ষিণ পশ্চিমস্থ নলান্দা নামক স্থানে গমন করেন। নলান্দা সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি কেন্দ্র ছিল। ঐ স্থানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। আট মহল বাটী, বহুসংখ্যক সুন্দর মন্দির ও অনেকগুলি অট্টালিকা জুড়িয়া এক শিক্ষালয় সুবৃহৎ উদ্যান অধিকার করিয়াছিল। সমগ্র বিদ্যালয়ের কার্য্য, সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত জনৈক তত্ত্বাবধারকের নিয়ন্তৃত্বে পরিচালিত হইত। বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ বৌদ্ধগণের ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বির বিবিধ বিষয়ক শিক্ষা তথায় প্রদত্ত হইত। এমন কি গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা দানের পদ্ধতিও অতি সুন্দর ছিল। বিভিন্নধর্ম্মী হইলেও অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিবার কাহারও কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। উদারভাবেই অধ্যাপনা কার্য্য চলিত। সে আজ কত কালের কথা। উহার ইতিহাস বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু তাহা হইলেও অতীত-ভারতের এই যে প্রাচীন শিক্ষা-দান ব্যবস্থা তাহা বক্তার কথায় বর্ত্তমান ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালের পক্ষে আদর্শের অবিষয় হইতে পারে না। Indian world. January-1908.

প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার।

"কি কারণে বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাস হইতেছে এবং তাহা নিবারণের উপায় কি"—এই বিষয়ে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই প্রবন্ধ-লেখককে ১০০৲ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে, এবং তাঁহার প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে ও আবশ্যক হইলে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হইবে। লিখিত প্রবন্ধ, আগামী ১২ই আশ্বিনের মধ্যে ১৯নং ষ্টোর রোড—বালীগঞ্জ কলিকাতা—এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিতব্য। বিচারক :—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, মাঘ মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৬৭॥৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৮১১।৶০
সমষ্টি	...	৩২৭৯৶৩
ব্যয়	...	৪১৬৶৩
স্থিত	...	২৮৬২৸৶০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেন্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

২৬২৸৶০

২৮৬২৸৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ২৪৮৸৶০

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেন্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান

২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী

২৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ মল্লিক

১৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

১৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু নরনাথ মুখোপাধ্যায়

২৫৲

শ্রীযুক্ত রাজা কালিপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র

৫৲

দানাধারে প্রাপ্ত

৸০

একটা কেরোসিনের টিন বিক্রয়

৶০

		২৪৮৸৶০
তত্ত্ববোধিনা পত্রিকা	...	১৭/০
পুস্তকালয়	...	২৩৵০
যন্ত্রালয়	...	১৭৮॥/৩
সমষ্টি	...	৪৬৭॥৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৬৪॥৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২১ /৩
পুস্তকালয়	...	॥৵৬
যন্ত্রালয়	...	১১৮৸/০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১১ ৻৩
সমষ্টি	...	৪১৬৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প
দ্বিতীয়ভাগ ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৯ ।

৭৭৮ সংখ্যা | ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
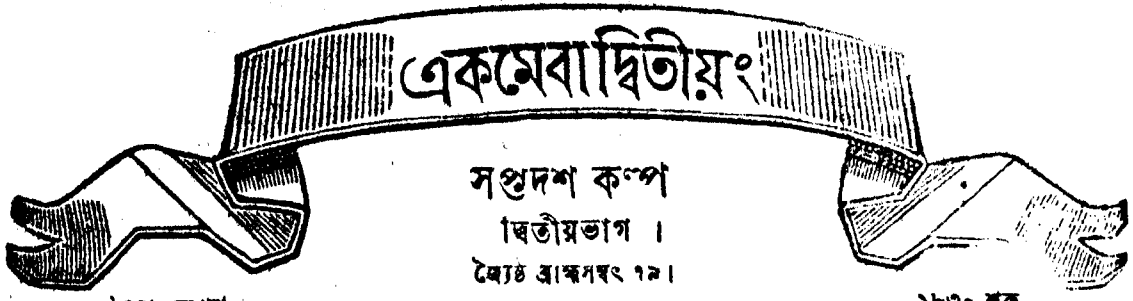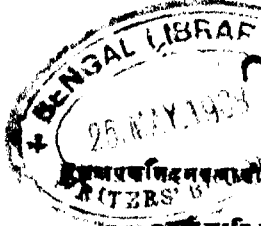
দুঃখ-রহস্য।

মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের রাজ্যে দুঃখ অমঙ্গল কেন? যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি কি এই অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারিতেন না? হয় তিনি চাহেন না, তাঁহার ইচ্ছা নাই; না হয় তিনি পারেন না, তাঁহার শক্তি নাই। এই দুঃখ সমস্যা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। ইহার মীমাংসা করিবার উদ্দেশে কোন কোন ধর্ম্মে মঙ্গল অমঙ্গল দুই পৃথক্ দেবতা কল্পিত হইয়াছে; তার সাক্ষী খৃষ্টধর্ম্মের সয়তান, পারসী ধর্ম্মের অহ্রিমান। কিন্তু তাহাতে এই গুহ্যের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না। সয়তান কিম্বা অহ্রিমান কখন স্বয়ম্ভু আদ্যশক্তি হইতে পারে না—তবে তাহাদের সৃষ্টি হইল কেন? অতএব আগেও যাহা এই দ্বিত্ব-কল্পনাতেও সেই আপত্তি। দেবতা এক; গতবারে বলিয়াছি, জগতে মঙ্গল অমঙ্গল একেরই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে—সুখ দুঃখ তাঁহারই ভৃত্য—যিনি জীবনদাতা তিনিই মৃত্যুর অধীশ্বর। এই বিষয়টি আর একটুকু তলাইয়া দেখা যাক্।

প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই আমাদের অপূর্ণতা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ সেদিন এখানে দুঃখ বিষয়ক যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে ঐ কথা সুন্দররূপে কবির ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব একসঙ্গে বাঁধা, কারণ অপূর্ণতাই ত দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সৃষ্টির অপূর্ণতা অনিবার্য্য। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্য্য কারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়াই পূর্ণের প্রকাশ, জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানব সমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখ চেষ্টার মধ্যেই সফলতা।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতার বিকাশের এক অঙ্গ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই, তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে, কিন্তু

তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ, তেমনি এই অপূর্ণতার একটি নিত্য সহচর দুঃখ ও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ।

ভ্রাতৃগণ! একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে অপূর্ণ বলিয়াই আমাদের দুঃখ, অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ, দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরম পূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে। সাধনা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি তাহার অর্থ এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনি পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই দুঃখ, সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম, আনন্দ—মুক্তি—ঈশ্বর।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ; সেই জন্য আর এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দ স্বরূপ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড় দুঃখ বহন করিবে কে? কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়, তাহার আনন্দও তত খানি; সম্রাটের সাম্রাজ্য রচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের সাধনাও তাই।"

কেহ আপত্তি করিতে পারেন এই যাহা বলা হইল ইহাতে সকল প্রকার দুঃখোৎপত্তির মীমাংসা হয় না। মানিলাম যে সাধনার দুঃখ, তপস্যার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তাহার পরিণাম সুখকর কল্যাণকর, এই দুঃখ আনন্দ-নিদান, অতএব ইহা দুঃখ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এমন কি দুঃখ কষ্ট নাই যাহা আমাদের ক্রিয়া-প্রসূত নহে, যাহাতে আমাদের নিজের কোন হস্ত নাই এবং যাহার ফলও সুখজনক হিতজনক নহে। এমন কত শত আকস্মিক বিপদ আসে মহামারী, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, নৌকাডুবী—তাহাতে কত কত গ্রাম নগর বিনষ্ট হইয়া যায়—কত শত নিরপরাধী মনুষ্য অকারণে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহার কারণ কি? হে মূঢ় মানব! যে মহা প্রাকৃতিক নিয়মে এই সকল উৎপাত ঘটিতেছে তুমি কি চাও তোমার সুবিধার নিমিত্ত বিশ্বপাতা তাহা বদলাইয়া দিবেন? মাধ্যাকর্ষণ, অগ্নির দাহিকা শক্তি, আলোকের পরাবর্ত্তন, বায়ুর গতি এই যে সকল নিয়মে সমগ্র বিশ্বের হিতসাধন হইতেছে তোমার জন্য তাহাদের রূপান্তর ঘটিবে? তিনি বলিতেছেন "আমার এই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম অখণ্ডনীয়, কিন্তু বৎস! তোমাকে এরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন করিয়া দিতেছি যাহার গুণে তুমি ক্রমে এই অন্ধ প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সেই ধীশক্তিকে মার্জ্জিত ও উন্নত কর, তাহার ফলে প্রকৃতি প্রভু না হইয়া দাসের ন্যায় তোমার পরিচর্য্যা করিবে, রোগের বিবিধ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবে, জল বায়ু অগ্নি ভৃত্যের ন্যায় তোমার সেবা করিবে, আকাশের বিদ্যুৎ তোমার

চামর ব্যজন করিবে এবং তোমার দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তোমার বাষ্পপোত উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া অনায়াসে গতি-বিধি করিবে, ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাস জানিয়া এবং সুকৌশলসম্পন্ন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হইতে সুরক্ষিত থাকিবে” এই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম যাহা আমরা আপাততঃ অমঙ্গল মনে করি তাহা সমগ্র বিশ্ব-জগতের কল্যাণপ্রসূ এবং মনুষ্যেরও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সহায়ভূত।

তবে মৃত্যু কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি মৃত্যু কি বাস্তবিকই অমঙ্গল? জন্ম হইলেই মৃত্যু—এ নিয়ম সার্ব্বজনীন, অপরিহার্য্য, ইহাতে দোষ ধরিবার কি আছে? আমরা যে মৃত্যুকে এত ভয় করি, তাহা তাহার নিজের জন্য তত নয়, রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা বিচ্ছেদ বিয়োগ তাহার এই সমস্ত আনুসঙ্গিক বিপদই ভয়ের কারণ। ভাবিয়া দেখ এই অধিকাংশ বিপদের জন্য আমরা কি আপনারাই দায়ী নহি? আমরা অনবধানতাবশত অনেক সময় মৃত্যুকে ডাকিয়া আনি, অত্যাচার দোষে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ বিধ্বংস করিয়া অকালমৃত্যুরূপ ফলভোগ করি, তখন আমরা আপনার দোষ না দেখিয়া বিধাতার প্রতি দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হই। আমরা সকলেই চিরায়ু প্রার্থনা করি, কিন্তু সত্যসত্যই যদি চিরজীবন বর পাইতাম তাহা হইলে কি বাস্তবিকই সুখী হইতাম? সে বর কি বিষম শাপ হইয়া দাঁড়াইত না? আর এক কথা, আমাদের আয়ু স্বল্প কিন্তু কাল অনন্ত। মৃত্যু আমাদের মাঝখানে আসিয়া এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া যায় মাত্র। আমরা এই পৃথিবীতে শিক্ষা ও পুণ্য অর্জ্জনের জন্য আসিয়াছি, আমাদের যোগ্যতা ও উন্নতি অনুসারে স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং—স্বর্গ হইতে স্বর্গ—আনন্দ হইতে আনন্দ—এই আমাদের গতি। যে ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আমাদের জন্ম, তাহা মধ্যপথের পান্থশালা মাত্র। আমরা অমৃতনিকেতনের যাত্রী, অনন্ত উন্নতির অধিকারী, অতএব মৃত্যু আমাদের ভয়ের জিনিস নহে, মৃত্যু আমাদের পরম হিতকরী বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

এই দুঃখ তত্ত্বের আর একদিক দেখিবার আছে। আমাদের শারীরিক মানসিক নানাপ্রকার দুঃখ বিপদ আছে, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক বিপদ যে পাপ তাহার উৎপত্তি কিসে হইল, কেন হইল? মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর কি এই পাপস্রোত প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না? তিনি আমাদের মধ্যে এই পাপের প্রবেশ কেন অনুমোদন করিলেন? খৃষ্টধর্ম্মের মতে এই পাপ হইতে মানব কুলের উদ্ধারের জন্য খৃষ্টের বলিদান আবশ্যক হইল। সে যাহা হউক, এই প্রশ্নের সহজ উত্তর যাহা আমার মনে হয় তাহা এই।

পাপ কি? না, ভাল মন্দ এই দুয়ের মধ্যে জানিয়া শুনিয়া মন্দ গ্রহণ করাই পাপ। অন্য কথায়, ভালমন্দ নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা হইতেই পাপের উৎপত্তি। যেমন উপনিষদে আছে

> শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
> স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয় ও প্রেয় আমাদের সম্মুখে, আমরা তাহাদের মধ্যে একটি ছাড়িয়া আর একটি বাছিয়া লইতে পারি।

> তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি
> হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে।

তাহাদের মধ্যে যিনি শ্রেয় গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

আমি শ্রেয় ও প্রেয়,—ন্যায় অন্যায় ধর্ম্ম অধর্ম্ম—ইহাদের মধ্য হইতে একটি বাছিয়া লইতে পারি, আমার এইটুকু স্বাধীনতা। ইহা হইতেই পাপ-পুণ্য। অবশ্য ঈশ্বর আমার আত্মাকে যন্ত্রের ন্যায় এমন করিয়া গঠিত করিতে পারিতেন যে, যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে এইরূপ বাধ্যতা থাকিত অথবা পশুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির অধীন করিয়া রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে আর আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিত না। ভ্রাতৃগণ! সেই অবস্থা কি প্রার্থনীয়? কখনই না। আত্মবলে পাপের উপর জয়লাভ করাতেই আমাদের পুরুষত্ব।

মনুষ্যের চরিত্র গঠন, আত্মার উন্নতি সাধন, ন্যায় সত্য ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়, তবে পাপের দ্বার মুক্ত রাখা ভিন্ন সে ইচ্ছা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

যদিও পাপাচরণে মনুষ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তথাপি পাপের পথে শত প্রকার বিভীষিকা রাখিয়া, বহুবিধ কণ্টক স্থাপন করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে পাপ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মনুষ্যজীবন এরূপে গঠিত, মনুষ্যসমাজ এরূপে নিয়মিত যে পাপের স্থায়িত্ব নাই—তাহার পরাভব হইবেই হইবে। আপাতত সে জয়লাভ করিতে পারে, কিন্তু পরিণামে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের মঙ্গলরাজ্যে সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না। ধর্ম্মেরই জয় হয়, অধর্ম্মের জয় হয় না। জীবনের নিয়মই এই যে পাপ আত্মঘাতী, মঙ্গল কল্যাণপ্রসূ। এই উভয়ের মধ্যে অনেককাল ধরিয়া সংগ্রাম চলিতে পারে কিন্তু পরিণামে মঙ্গলেরই জয়।

জগতের ইতিহাস দেখ। ফরাসিস বিপ্লবে প্রলয়ের রাক্ষসেরা এক সময় কি ঘোর পাশব নৃত্যে মাতিয়া উঠিল—দিগ্‌দিক রক্তস্রোতে ভাসিয়া গেল, কিন্তু সে কতকালের জন্য? শীঘ্রই সেই শোণিতে ইউরোপীয় সমাজ শোধিত হইল—সমীচীন সভ্যতা ও উন্নতির যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

ব্যক্তিগত জীবনেও ঐ দেখা যায়। আমরা যদি দশজনে মিলিয়া স্বার্থের প্ররোচনায় কোন কার্য্য আরম্ভ করি—প্রতিজনে আপনার আপনার দেখিয়া কার্য্য করি তাহা হইলে কি হয়? পরস্পরের স্বার্থের বিরোধ উপস্থিত হইয়া সে কার্য্য কি ভণ্ডুল হইয়া যায় না? আর যে কার্য্যের মূল ন্যায়, যে কার্য্যের মূলে মৈত্রী, লোকহিত যে কার্য্যের মূল-প্রবর্ত্তক, সে কার্য্যের উপর ঈশ্বরের প্রসাদ বর্ষিত হইয়া তাহা সফল ও সুসিদ্ধ হইবেই হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়মই এই যে যাহা মঙ্গল তাহার বিকাশ, যাহা অমঙ্গল তাহার বিনাশ। যে মঙ্গল অনুষ্ঠান করে, তার ক্রমশই বলবৃদ্ধি হয়—পাপকারীর ক্রমেই বলক্ষয় হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যাহা, মানবসমাজ ও জাতির পক্ষেও সেই নিয়ম।

অবশ্য আপাতত অধর্ম্মের জয় দেখিয়া মনে হইতে পারে এই বুঝি অধর্ম্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু বন্ধুগণ ইহা নিশ্চয় জানিও তাহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্ম দ্বারা আজ ইনি সম্পদবান্, পরে ইঁহার সকল দিক্ প্রসন্ন—শত্রুদল পদদলিত—সমূলস্তু বিনশ্যতি—পরিশেষে সমূলে বিনাশ।

আমি এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার

প্রয়োজন দেখি না। দুঃখ-রহস্য প্রকাণ্ড ও অতীব দুরূহ ব্যাপার। কূটতর্কের সমুদয় আপত্তি তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আপনাদের চিন্তার জন্য মোটামুটি কতকগুলি যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিলাম। কুতর্কের অন্ত নাই। ভগবান যদি কোন পণ্ডিতাভিমানী তার্কিককে অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন, অশেষ সুখে সুখী করেন তাহা হইলেও সে বলিবে, এ অপেক্ষাও আমাকে অধিক সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী কেন করিলেন না? সংশয়াত্মার মনে কিছুতেই শান্তি হয় না। আমরা এই অনর্থক তর্কজালে আবদ্ধ হইব না। মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস ভিন্ন আমাদের শান্তি নাই, গতি নাই। শিশু যেমন আপন মাতার আন্তরিক ভাব অনেক সময় বুঝিতে পারে না, তাঁহার স্নেহের তাড়না পাইয়া ক্রন্দন করে অথচ জননীর ভালবাসার প্রতি সন্দেহ করে না, তাঁহার ক্রোড় আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ, আমরাই বা কি? আমরা অন্ধকারে ভীত হইয়া শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করি কিন্তু হাজার ভয় পাই, দুঃখ পাই, কখনই সেই অখিলমাতার স্নেহের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস হারাইব না। আমরা সেই সকল মহাপুরুষের আদর্শে জীবন গড়িয়া তুলিব, যাঁহারা আমাদের আধ্যাত্মিক নেতা, ধর্ম্মগুরু, ধর্ম্মপিতা, যাঁহারা সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়া, অশেষ দুঃখ ক্লেশ মাথায় বহিয়াও সেই মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস হারান নাই; তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অকুতোভয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং তাঁহারই হস্তে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তে আমরা বলিব—

হে ভগবন্! আমাকে বধ কর তথাপি তোমাকে অবিশ্বাস করিব না, তোমার চরণ ধরিয়া থাকিব। হে মঙ্গলময়, আমরা তোমার গূঢ় অভিপ্রায় কি বুঝিব? কিন্তু বুঝি বা না বুঝি—আমরা নিশ্চয় জানি তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্যই সকল করিতেছ।

জানি তুমি মঙ্গলময়
প্রতি পলকে পাই পরিচয়।
সুখে রাখ দুখে রাখ যে বিধান হয়
কিছুতেই নাহি ভয়।
জানি তুমি মঙ্গলময়।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বার্থের নীতি।

ঐন্দ্রিয়িক দর্শনশাস্ত্র, সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, এমন-একটা নীতিতন্ত্রে অগত্যা উপনীত হইয়াছে যে নীতির মূলসূত্র স্বার্থ।

মানুষ সুখ ও দুঃখ অনুভব করে; মানুষ সুখের অন্বেষণ করে ও দুঃখ হইতে পলায়ন করে। ইহাই তাহার গোড়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সুখের বিষয় পরিবর্ত্তন হইতে পারে, নানাপ্রকারে সুখের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতে পারে; কি শারীরিক, কি মানসিক, কি নৈতিক,—সুখ যে আকারই ধারণ করুক না কেন—মানুষ সতত সেই সুখেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

বিশেষ বিশেষ সুখজনক অনুভূতিসমূহ যখন সামান্যে পরিণত হয়, তখন উহা "উপযোগী" এই নাম ধারণ করে; যে

সুখ শুধু অমুক অমুক ক্ষণে বদ্ধ নহে, পরন্তু কালের অনেকটা অংশ অধিকার করিয়া থাকে,—সে যে প্রকার সুখই হউক না কেন—তাহারই বিপুল সমষ্টিকে আনন্দ বলে।

সুখ ও আনন্দ যে ব্যক্তি অনুভব করে, সেই অনুভবকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে এই সুখ ও আনন্দ আপেক্ষিক; ইহা আসলে ব্যক্তিগত। সুখ ও আনন্দকে ভালবাসিয়া আমরা নিজে-কেই ভালবাসি।

সকল জিনিসের মধ্যেই এই সুখ ও আনন্দ অন্বেষণ করিবার উদ্দেশে আমরা যাহার দ্বারা পরিচালিত হই তাহাই স্বার্থ।

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যেরূপ আনন্দ, আমাদের সমস্ত কাজের একমাত্র প্রবর্ত্তক সেইরূপ স্বার্থ।

নিজের স্বার্থ ছাড়া মানুষ আর কিছুই অনুভব করে না, কিন্তু প্রকৃত স্বার্থ মানুষ কখন ঠিক্ বুঝে, কখন ঠিক্ বুঝে না। সুখী হইবার একটা বিশেষ কলাকৌশল আছে। সুখের মধ্যে কোন দুঃখ প্রচ্ছন্ন আছে কি না তাহা পরীক্ষা না করিয়া, জীবন পথে কোন সুখ আসিলেই যেন আমরা তাহাকে আলিঙ্গন না করি। বর্ত্তমান সুখই সব নহে। ভবিষ্যৎ চিন্তাও আবশ্যক; যে ভোগসুখ পরিতাপ আনয়ন করিতে পারে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে; আনন্দের জন্য—অর্থাৎ যে সুখ অধিকতর স্থায়ী ও ততটা উন্মাদক নহে সেই উচ্চতর সুখের জন্য—এই নীচ সুখকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। শারীরিক সুখই একমাত্র সুখ নহে; ইহা ছাড়া অন্য সুখও আছে—যথা, মনের সুখ, মতের সুখ। জ্ঞানী ব্যক্তি, একজাতীয় সুখের দ্বারা অন্য জাতীয় সুখের তীব্রতা নষ্ট করেন।

উচ্চতর সুখের নীতিই স্বার্থের নীতি, তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই নীতি —সুখের স্থানে আনন্দকে, মনোজ্ঞের স্থানে উপযোগীকে, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগের স্থানে, পরিণামদর্শিতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই নীতি— ভাল মন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতি শব্দ অস্বীকার করে না, পরন্তু নিজের ধরণে উহাদিগের ব্যাখ্যা করে। বিবেকদৃষ্টিতে যাহা আমাদের প্রকৃত স্বার্থ তাহাই মঙ্গল, তাহার বিপরীতই অমঙ্গল। যে জ্ঞানীর জ্ঞান, প্রবৃত্তির আবেগকে প্রতিরোধ করিতে পারে, বাস্তবিক যাহা উপযোগী তাহা উপলব্ধি করিতে পারে, এবং আনন্দের ধ্রুবপথ অনুসরণ করিতে পারে, সেই উচ্চতর জ্ঞানই ধর্ম্ম। ভ্রান্তচিত্ত ও চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া যখন বিপদসঙ্কুল ক্ষণস্থায়ী সুখের নিকট আমরা আনন্দকে বলিদান দিই তখনই তাহা অধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ধর্ম্ম অধর্ম্মের পরিণামই পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার। বিবেকের পথ দিয়া যদি আমরা সুখকে অন্বেষণ না করি, তাহা হইলে তাহার দণ্ডস্বরূপ আমরা সুখ হইতে বঞ্চিত হই। সাধারণের মতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, স্বার্থনীতি সেই সকল কর্ত্তব্যের একটিকেও ধ্বংস করিতে চাহে না; প্রত্যুত স্বার্থনীতি বলে যে, ঐ সমস্ত আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থেরই অনুকূল, এবং সেই জন্যই উহা আমাদের কর্ত্তব্য। লোকের উপকার করা, নিজেরই হিতসাধন করিবার ধ্রুব উপায়; এইরূপেই আমরা লোকের সমাদর, লোকের দয়া, লোকের সাহানুভূতি অর্জ্জন করি। ইহা যেমন মনোরম, তেমনি উপযোগী। নিঃস্বার্থভাবেরও একটা গূঢ় অর্থ আছে।

সাধারণত লোকে এই শব্দটির যেরূপ অর্থ করে অর্থাৎ প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন—অবশ্য সে অর্থে নিঃস্বার্থপরতা নিতান্তই একটা অসঙ্গত অমূলক কথা; তবে কি না, ভবিষ্যৎ

স্বার্থের জন্য বর্ত্তমান স্বার্থকে—উচ্চতর সূক্ষ্মতর সুখের জন্য, স্থূলতর হীনতর সুখকে বিসর্জ্জন করা যাইতে পারে। অনেক সময়ে আমরা বুঝিতেই পারি না যে আমরা সুখের অন্বেষণ করিতেছি এবং এইরূপ বুঝিবার দোষেই আমরা নিঃস্বার্থপরতারূপ এমন একটা আকাশকুসুমকে আমাদের মনোমধ্যে সৃষ্টি করি যাহা মানব প্রকৃতির অতীত ও একেবারেই দুর্ব্বোধ্য!

আমরা উপরে যে স্বার্থনীতির ব্যাখ্যা করিলাম, ভরসা করি তাহা অতিরঞ্জিত হয় নাই। আমরা বরং আর একটু বেশী দূর অগ্রসর হইব। আমরা স্বীকার করি যে, এই নীতি অন্য নীতিতন্ত্রের আতিশয্য-প্রসূত একটা প্রতিক্রিয়া। একবার সেই অত্যন্ত কঠোর ষ্টোয়িক নীতির কথা কিংবা সেই তাপস-নীতির কথা ভাবিয়া দেখ—সে নীতি চৈতন্যকে নিয়মিত না করিয়া চৈতন্যকে একেবারেই ধ্বংস করিতে বলে এবং রিপুর আবেগ হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য, সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেই বিসর্জ্জন করিতে বলে—একপ্রকার আত্মহত্যা করিতে বলে। এই দুই নীতির প্রতিবাদস্বরূপ এই স্বার্থনীতির বৈধতা কতকটা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এপিক্‌টেটাসের উচ্চতর দাসত্বের জন্য—দুঃখ দুর্দ্দশা অতিক্রম করিবার চেষ্টা না করিয়া উহা অকাতরে সহ্য করিবার জন্য—মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। অথবা মঠ-নিবাসী দেবপ্রকৃতি প্যাস্‌কাল ও তাঁহার ভগিনী যেরূপ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুকে আহ্বান করিতেন এবং কঠোর তপশ্চারণ ও মূক আরাধনার দ্বারা মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনিতেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের প্রবৃত্তি-সকল অকারণে হয় নাই, তাহাদেরও প্রয়োজন আছে। বায়ুর অভাবে, তরী চলিতে পারে না এবং শীঘ্রই রসাতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এমন কোন ব্যক্তিকে কল্পনা কর যাহার আত্মপ্রীতি নাই, যাহার আত্মসংরক্ষণের স্বাভাবিক সংস্কার নাই, যাহার কষ্টের ভয় নাই, বিশেষতঃ যাহার মৃত্যুভয় নাই, সুখ কিংবা আনন্দ রসাস্বাদনের যাহার রুচি নাই, এক কথায়, ব্যক্তিগত সমস্ত স্বার্থ হইতে যে বঞ্চিত,—এরূপ ব্যক্তি, তাহার চারিদিকে যে সকল অসংখ্য ধ্বংসের কারণ রহিয়াছে—তাহার সহিত দীর্ঘকাল যুঝাযুঝি করিতে পারে না—তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; সে ব্যক্তি একদিনও পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায়, কোন একটি পরিবার, কিংবা কোন একটি ক্ষুদ্র সমাজ সংগঠিত কিংবা সংরক্ষিত হইতে পারে না। যিনি মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেই মানুষকে শুধু ধর্ম্মের হাতে, দয়ার হাতে, মহত্ত্বের হাতে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি মানবজাতির বিকাশ ও স্থায়িত্বকে অপেক্ষাকৃত একটা সামান্য অথচ ধ্রুব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মনুষ্যকে আত্মপ্রীতি দিয়াছেন, আত্মরক্ষণের প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সুখ ও আনন্দ-রসাস্বাদনের রুচি দিয়াছেন, জ্বলন্ত প্রবৃত্তিসমূহ দিয়াছেন, আশা ও ভয় দিয়াছেন, প্রেম দিয়াছেন, উচ্চাভিলাষ দিয়াছেন, অবশেষে সেই ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি দিয়াছেন যাহা সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক, যাহা স্থায়ী, যাহা বিশ্বজনীন, যাহা, সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার জন্য নিয়তই আমাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে।

অতএব, স্বার্থনীতির মধ্যে যে মূলতত্ত্বটুকু আছে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা

প্রতিবাদ করি না; এই মূলতত্ত্বটি খুবই সত্য, উহার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। আমরা শুধু এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিঃ—স্বীকার করি, স্বার্থনীতির অন্তর্নিহিত মূল-তত্ত্বটি আসলে সত্য, কিন্তু উহা ছাড়া আর কি কোন মূলতত্ত্ব নাই যাহা উহারই মত সত্য, উহারই মত বৈধ? সত্যবটে মানুষ প্রেমের অন্বেষণ করে, সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু মানুষের অন্তরে কি আর কোন অভাববোধ নাই—আর কোন হৃদয়ভাব নাই যাহা উহাদেরই মত প্রবল, উহাদেরই মত জ্বলন্ত?

আমাদের দেহ ও আত্মা যেমন একত্রেই অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ এই মানব-জাতির মধ্যে, বিশ্ববিধাতার এই গভীর রহস্যময় সৃষ্টিকল্পনার মধ্যে, এমন কতকগুলি বিভিন্ন মূলতত্ত্ব একত্র অবস্থিত—যাহারা পরস্পরকে কখনই বহিষ্কৃত করে না।

ঐন্দ্রিয়িক দর্শনশাস্ত্র অবিরত প্রত্যক্ষ অনুভবেরই দোহাই দিয়া থাকে। প্রত্যক্ষকে আমরাও সাক্ষী মানিয়া থাকি; আমরা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে যে সকল তথ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা হইতেই গৃহীত—সেইগুলি সহজ জ্ঞানের গোড়ার ধারণা। যে সকল তথ্যের উপর স্বার্থনীতি প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল তথ্য আমরা স্বীকার করি, কিন্তু স্বার্থনীতির পদ্ধতিটা আমরা স্বীকার করি না। যথাপরিমাণে দেখিলে তথ্যগুলিকে সত্য বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ঐ নীতিপদ্ধতি, ঐ তথ্যগুলির প্রভাব-পরিসর অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাই উহা মিথ্যা; উহাদেরই মত অবিসম্বাদিত আরও যে অন্যান্য তথ্য আছে তাহা ঐ নীতিতন্ত্র অস্বীকার করে বলিয়াই উহাকে আমরা মিথ্যা বলি।

প্রকৃত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা এবং তাহাদের মধ্যে যদি কোন বাস্তবিক পার্থক্য থাকে তাহা স্বীকার করা—ইহাই প্রকৃতিস্থ দর্শনশাস্ত্রের গোড়ার নিয়ম। এই দর্শন-শাস্ত্র, সর্ব্বাগ্রে সত্যের অনুসরণ করে—ঐক্যের অনুসরণ করে না। সত্যকে অনুসরণ করা দূরে থাক্, স্বার্থনীতি সত্যকে অঙ্গহীন করিয়া ফেলে; উহা তথ্যসমূহের মধ্য হইতে সেই সকল তথ্যকেই নির্ব্বাচন করে যাহা স্বার্থনীতির উপযোগী, এবং যে সকল তথ্য আসলে ধর্ম্মনীতির মূল-উপাদান, ঠিক সেই সব তথ্যকেই উহা অগ্রাহ্য করে। এই একদেশদর্শী পর-মত-অসহিষ্ণু নীতি,—যাহা-কিছুর হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারে না, ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তাহারই অস্তিত্ব অস্বীকার করে। কলারচনার হিসাবে দেখিলে এই নীতিতন্ত্রের মধ্যে বেশ একটি বাঁধুনি আছে, কিন্তু মানবপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির বিচিত্র শক্তির সহিত যখন ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখনই ইহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

আমরা দেখাইব, ঐন্দ্রিয়িক দর্শনশাস্ত্র-প্রসূত এই স্বার্থনীতি, মানব প্রকৃতির অন্তর্ভূক্ত কতকগুলি ব্যাপারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রথমত আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি,—প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হইতেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার শক্তিকে, কর্তৃত্ব-শক্তিকে সমস্ত মানবজাতিই স্বীকার করে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই সকলে চাহে, এই স্বাধীনতা লোকসমাজেও সম্মানিত ও সংরক্ষিত হয়। স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া যে একটা জিনিস আছে ইহা প্রত্যেকেরই অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দেয়। নৈতিক অনুমোদন অননুমোদনের মধ্যে, সমাদর অবজ্ঞার মধ্যে, প্রশংসা ধিক্কারের মধ্যে, পাপ পুণ্যের মধ্যে, দণ্ড পুরস্কারের

মধ্যে—সর্ব্বপ্রকার নৈতিক ব্যাপরের মধ্যে এই স্বাধীনতার ভাব জড়িত রহিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, এই যে বিশ্বজনীন তথ্য যাহা মানবজাতির সমস্ত বিশ্বাসের মূলে অবস্থিত—যাহা, কি গার্হস্থ্য কি সমাজিক—মানবের সমস্ত জীবনকে পরিশাসিত করে, এই তথ্যটিসম্বন্ধে ঐন্দ্রিয়িক দর্শন শাস্ত্র ও স্বার্থনীতি কি বলেন?

(ক্রমশঃ)

কেরোসিন্ তৈল।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের পরিবারে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয়, তখনকার একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা আজ মনে পড়িয়া গেল। আমাদের একটি অতি বৃদ্ধা ধাত্রী ছিল। প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারসম্বন্ধে খট্‌কা উপস্থিত হইলেই আমরা সেই বৃদ্ধার শরণাপন্ন হইতাম। ব্যাখ্যানপ্রদানে সে সিদ্ধবিদ্যা লাভ করিয়াছিল। মেঘের চলাচল, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎস্ফুরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত প্রেত-ব্রহ্মদৈত্যের আবির্ভাব প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের ব্যাখ্যান তাহার জিহ্বাগ্রে থাকিত। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাহার শরণাগত হইয়া, আমরা কখনই নিরাশ হই নাই। বৃদ্ধা কেরোসিন তৈল কোনক্রমে স্পর্শ করিত না, এবং আমাদিগকেও স্পর্শ করিতে দিত না। একদিন এই বিতৃষ্ণার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। ধাত্রীর ব্যাখ্যানে জানিয়াছিলাম, দেশের সমস্ত মৃত জন্তুর গলিত দেহ কলের ঘানিতে ফেলিয়া সাহেবেরা যে তৈল বাহির করে, তাহাই কেরোসিনের রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

কেরোসিন তৈলের প্রস্তুত প্রণালীর পূর্ব্বোক্ত বিবরণটি বহুদিন ধরিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। অবশ্য এখন আর সে বিশ্বাস নাই। সুদূর পল্লীবাসীও এখন ঐ প্রকার একটা অদ্ভূত প্রস্তুত প্রণালীতে বিশ্বাসস্থাপন করিবে না; কিন্তু কেরোসিনের উৎপত্তিতত্ত্ব জানিবার জন্য বিজ্ঞানগ্রন্থ খুলিলে আমাদের সেই বৃদ্ধা ধাত্রীর কথার সহিত বৈজ্ঞানিকের উক্তির মূলে মিল দেখা যায়। কলের ঘানিতে মৃতদেহ পেষণ করিয়া সাহেবেরা তৈল বাহির করেন না, প্রকৃতিই ভূপ্রোথিত জীবদেহের উপর চাপ দিয়া কোন প্রকারে তৈল উৎপন্ন করিয়া থাকেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের উক্তির ইহাই সারমর্ম্ম।

কেরোসিন তৈল যে একটা জৈব পদার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সকলেই ইহাতে একমত হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর যে সকল অংশে অতি প্রাচীন কয়লার খনি আছে, কেরোসিন তৈলও সেই সকল স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়; সুতরাং কয়লা যে প্রকার ভূপ্রোথিত উদ্ভিদের দেহ হইতে উৎপন্ন হয়, কেরোসিনও সেইপ্রকার যুগ-যুগান্তরের মাটিচাপা বৃক্ষাদি হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। উদ্ভিদ্ শরীরে কেরোসিনের ন্যায় পদার্থের অভাব নাই। টার্পিন তৈল ও ধুনা প্রভৃতি দাহ্য বস্তু উদ্ভিদ্ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই বৃক্ষাদির যে সকল অংশ হইতে টার্পিন্ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, তাহাই বহুকাল প্রোথিত থাকিয়া ভূগর্ভের চাপ ও তাপে যে শেষে কেরোসিন হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বৈজ্ঞানিকের নিকট হীরক ও কয়লা একই জিনিস। বিশ্লেষণে এক অঙ্গার ব্যতীত অপর কোন জিনিসই হীরকে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কয়লাই বহুকাল ভূপ্রোথিত থাকিলে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপে ও উপরের মৃত্তিকার চাপে তাহার মলিনতা ঘুচিয়া যায়। ধরা-কুক্ষির বৃহৎ কর্ম্মশালায় কি প্রকারে কেবল চাপ ও তাপের সাহায্যে তুচ্ছ কৃষ্ণ অঙ্গার অত্যুজ্জ্বল ও বহুমূল্য হীরকে পরিণত হয়, তাহা জানা ছিল না। অল্পদিন হইল একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক কয়লাকে ভূগর্ভের অবস্থায় ফেলিয়া, তাহাকে

হীরকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। বৃক্ষ নির্য্যাসকে ঐ প্রক্রিয়ায় কেরোসিনে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

কেবল কয়লার খনির নিকটেই যে কেরোসিন তৈল পাওয়া যায়, এখন আর একথা বলা চলে না। অনেক অঙ্গারবর্জ্জিত স্থানেও আজকাল কেরোসিনের খনি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এইসকল স্থানের কেরোসিন উদ্ভিদ-দেহজ নয়। প্রাণীর দেহ বহুকাল ভূপ্রোথিত থাকিলে, দেহের তৈলময় উপাদানগুলি নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়া শেষে কেরোসিন হইয়া দাঁড়ায়। এইসকল কেরোসিন্ খনির চারিদিকের ভূমি খনন করিলে, সত্যই অনেক জীবকঙ্কাল বাহির হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রাণীর বসা ইত্যাদি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কেরোসিনের আকার প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতেও অবিশ্বাস করা যায় না।

আজ চল্লিশ বৎসর হইল, কেরোসিনের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেখিলে মনে হইতে পারে, ভূগর্ভে যে এপ্রকার একটা তৈল সঞ্চিত আছে প্রাচীনেরা বুঝি তাহার কোন সন্ধান রাখিতেন না; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। প্রাচীনেরা ইহার খুবই সন্ধান রাখিতেন, এবং আবশ্যক মত ব্যবহারও করিতেন। নিনেভা ও বাবিলনের নগর-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষগুলি পরীক্ষা করিলে, তাহার চূণ সুরকির সহিত একপ্রকার অপরিচ্ছন্ন কেরোসিন মিশ্রিত দেখা যায়। এই জিনিসটাকে গৃহনির্ম্মাণের অপর উপাদানগুলির সহিত ব্যবহার করিলে যে গাঁথুনি দৃঢ় হয়, এবং জলে তাহার ক্ষতি করিতে পারে না, চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার লোকেরাও তাহা জানিতেন।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কেরোসিন তৈলের আকরের অল্পাধিক সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ও কানাডা-প্রদেশে ইহার খুব বড় বড় আকর আছে। তা'ছাড়া রুসিয়া ও আমাদের ব্রহ্মদেশেও কেরোসিন পাওয়া যাইতেছে। মাটি খুঁড়িলে কয়লা প্রভৃতি আকরিক জিনিসকে যে প্রকার স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখা যায়, কেরোসিনকে সেপ্রকার বিশেষ স্তরে পাওয়া যায় না। যদি মাটিতে কেরোসিন্ থাকে, তবে ভূগর্ভের স্থানে স্থানে যে সকল ফাটাল দেখা যায়, পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা হইতে তাহাতেই তৈল আপনা হইতে সঞ্চিত হয়। উপর হইতে খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া সেই সকল ফাটাল বাহির করিলেই জল ও বাষ্পমিশ্রিত তৈল ফোয়ারার মত ছুটিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে খনির ভিতরকার আবদ্ধ বায়ু-বায় ও জলীয় অংশ বাহির হইয়া গেলে, খাঁটি তৈল গহ্বরে পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীগণ পম্প লাগাইয়া তৈল সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

আকর হইতে যে সকল তৈল সদ্য উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত আমাদের পরিচিত কেরোসিন তৈলের কোনই সাদৃশ্য থাকে না। তৈল প্রস্তুতকারীগণ নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই অবিশুদ্ধ তৈলকে নির্ম্মল করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া থাকেন। একশত ভাগ আকরিক তৈল লইয়া কেরোসিন্ প্রস্তুত করিতে গেলে, কেবল পঞ্চান্ন ভাগ মাত্র খাঁটি নির্ম্মল তৈল পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ভাগ হইতে গ্যাসোলিন্, ন্যাপ্থা প্যারাফিন্ ও কলে দিবার তৈল প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস প্রস্তুত হয়। স্থূল কথায়, আকরিক তৈলের অতি অল্প অংশ অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

অবিশুদ্ধ আকরিক তৈলের শোধন-পদ্ধতি অতি সহজ। গুড়ের ন্যায় ঘন তৈলকে কতকগুলি আবদ্ধমুখ কটাহে রাখিয়া ফুটানো হয়। কটাহের আবরণের সহিত লৌহের বড় বড় নল সংযুক্ত থাকে। তৈল ফুটিতে আরম্ভ করিলে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা ঐসকল নল দ্বারা আর এক শীতল পাত্রে পৌঁছিয়া তথায় জমিতে আরম্ভ করে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম কালে যে জিনিসটা শীতল পাত্রে জমা হয়, তাহা দ্বারা বিশেষ কোন কাজ পাওয়া যায় না।

তাহাকে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত প্রথায় চোয়াইলে গ্যাসোলিন্, বেন্‌জিন্ এবং ন্যাপ্‌থা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলি পাওয়া যায়। কটাহের তৈল ফুটিতে আরম্ভ করিয়া মাঝামাঝি সময়ে যে সকল বাষ্প ছাড়িতে আরম্ভ করে, তাহাই আমাদের পরিচিত কেরোসিনের বাষ্প। ইহা সেই সুদীর্ঘ নল বহিয়া শীতল পাত্রে আসিয়া তরল হইলেই কেরোসিন প্রস্তুত হয়।

এই প্রকারে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহার সহিত আমাদের পরিচিত কেরোসিনের খুব সাদৃশ্য থাকিলেও জিনিসটাকে ঠিক্ বাজারের ভাল কেরোসিনের মত নির্ম্মল দেখায় না। ইহার সহিত শতকরা দুই ভাগ সল্‌ফিউরিক এসিড মিশাইলে ময়লা কাটিয়া নীচে থিতাইতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈল বেশ স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধহীন হইয়া দাঁড়ায়। অতি উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে, ইহার পর তৈলে এমোনিয়া বা কষ্টিক্ সোডা মিশানো হইয়া থাকে। ইহাতে তৈলে অণুমাত্র মলিনতা থাকে না, এবং দুর্গন্ধও প্রায় লোপ পাইয়া যায়।

অপরিচ্ছন্ন আকরিক তৈল কটাহে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, সর্ব্বপ্রথমে যে ন্যাপ্‌থা প্রভৃতির বাষ্প বহির্গত হইয়া জমা হয়, তাহা তৈলরূপে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী; কিন্তু জিনিসটার প্রস্তুত ব্যয় অতি অল্প বলিয়া, অনেক ব্যবসায়ী অন্যায় লাভের আশায় ভাল কেরোসিনের সহিত এই জিনিসটাকে প্রায় মিশাইয়া থাকে। ল্যাম্প ফাটিয়া গিয়া যে সকল দুর্ঘটনা ঘটায়, তাহার মূল কারণ ঐ ন্যাপ্‌থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে সকল তৈল একশত তেত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপে প্রজ্বলিত হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই উৎকৃষ্ট তৈল বলা হইয়া থাকে; কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, তাহারই সহিত শতকরা একভাগ ন্যপ্‌থা মিশাইলে, মিশ্র তৈল একশত তিন ডিগ্রি উত্তাপেই জ্বলিয়া উঠে। সৎ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কেরোসিন্ না কিনিলে, কখন কখন তৈলে শতকরা পাঁচভাগ পর্য্যন্ত ন্যাপ্‌থা পাওয়া গিয়া থাকে। এই তৈল ৮৩ ডিগ্রি উত্তাপ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে; সুতরাং এ প্রকার নিকৃষ্ট জিনিস ব্যবহারে বিপদের সংঘটন মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

কেবল দুর্ঘটনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই যে উৎকৃষ্ট তৈলের ব্যবহার আবশ্যক, তাহা নয়। অল্প খরচে অধিক আলোক পাইতে হইলেও উৎকৃষ্ট তৈল ব্যবহার করা আবশ্যক। অনেক সময়ে বাজারের তৈল ভাল ল্যাম্পে ব্যবহার করিতে গিয়া দেখা যায়, শিখা ধূমময় হইয়া পড়িতেছে। ইহাও তৈলমিশ্রিত ন্যাপ্‌থারই একটা লক্ষণ। এ প্রকার তৈল অল্প মূল্যে পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু জিনিসটা এত অপরিচ্ছন্ন আলোক দিয়া শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায় যে, ইহার ব্যবহারে গৃহস্থমাত্রকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তা' ছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় রহিয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভাল তৈল পুড়াইয়া যে পরিমাণ আলোক পাওয়া যায়, মধ্যম শ্রেণীর তৈলে তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ মাত্র আলোক পাওয়া গিয়া থাকে।

কেরোসিন্ তৈল আজকাল আমেরিকায় একটা প্রধান পণ্যদ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর নানা স্থানের কেরোসিনের বড় বড় আকরগুলি ১৮৬০ সাল পর্য্যন্তও অনাদৃত ব্যবস্থায় পড়িয়াছিল। দেশের অতি প্রাচীন জঙ্গলের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলিই ইন্ধন জোগাইত। এখন আর সে জঙ্গল নাই। প্রায় সকল অরণ্যভূমিই কৃষিক্ষেত্র বা গ্রাম-নগরে পরিণত হইয়াছে। কাজেই বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানার খাদ্য জোগাইবার জন্য আমাদিগকে রত্নগর্ভা ধরা-দেবীরই শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। মনে হয়, ভবিষ্যৎ সন্তানদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই যেন বসুন্ধরা যুগযুগান্তর ধরিয়া এই সকল অমূল্য দ্রব্য বহন করিয়া আসিতেছেন।

অতি প্রাচীনকালে যে অবস্থায় পড়িয়া বৃক্ষাদি ভূপ্রোথিত হইয়াছিল, পৃথিবীর এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন বৃক্ষাদি

আর ভূপ্রোথিত হইতে পারিতেছে না; সুতরাং নূতন করিয়া কয়লা বা কেরোসিন্ তৈলেরও উৎপত্তি হইতেছে না, অথচ পূর্ব্বসঞ্চিত কয়লা ইত্যাদির ব্যয় ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি বা আর একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কয়লা ও কেরোসিনের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যায়; কিন্তু আমরা ইহাতে কোন আশঙ্কারই কারণ দেখি না। মানবজাতি বিধাতার নানা আশীর্ব্বাদে ভূষিত হইয়া প্রাণীরাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সৃষ্টিরক্ষার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কখনই তাহার অধিকারভুক্ত বলা যায় না। বৃহৎ অরণ্যগুলির ধ্বংসের পর মানব যখন ইন্ধনের অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিধাতারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে ভূগর্ভে নূতন ইন্ধনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এই ভাণ্ডার শূন্য হইলে, সেই বিধাতারই অকথিত বাণী ইন্ধন-সংগ্রহের নব নব সহজ উপায় বলিয়া দিবে।

ধর্ম্ম ও একতা।

আজ আমরা যে একত্র সমবেত হইয়াছি ইহা কাহার জন্য, কাহার উদ্দেশে?—তোমাকে সকলে মিলিয়া একত্রে আহ্বান করিতে পারিব বলিয়া, তোমার আলোকে আমাদের চক্ষুর অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিব বলিয়া। তোমার আলোকের সাহায্যে আমাদের মনের সকল জঞ্জাল দূর হইয়া যাইবে। আমরা যে অন্ধ—আমরা কি করিয়া তোমার সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিব ও তোমার মর্য্যাদা বুঝিব, কি করিয়া তোমার মহিমা প্রচার করিব?—তুমি পথপ্রদর্শক না হইলে আমরা কোথায় যাইতে পারি? তুমি অন্ধের যষ্টি, তোমার উপর নির্ভর না করিয়া এক পদও আমরা অগ্রসর হইতে পারি না। তুমি আমাদের চক্ষুর মণি হইয়া আলোক বিতরণ কর, তবে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। যেমন উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে শিশুর মন ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং তাহার দিকে ছুটিয়া যায়, সেইরূপ তোমার আলোক হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য আমাদের মন তোমার প্রতি ধাবিত হয়। তোমার দেখা পাইলে আমাদের সকল বিষয়ে অভয় আসিবে, অন্ধকারের ভয় চলিয়া যাইবে, তখন আর নির্জীব ভাবে জীবন কাটাইতে হইবে না। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে সেই প্রদীপ জ্বালাইয়া দাও, আমাদের মনকে ধৈর্য্য বিনয় সহিষ্ণুতা দয়া ও ক্ষমায় বিভূষিত করিয়া দাও, প্রত্যেকের হৃদয়কে সেই আলোকে জাগ্রত করিয়া নব উদ্যমে—নব উৎসাহে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত কর।

আমাদের এই দুর্দ্দিন দুরবস্থা হইয়াছে কেন? কেবল একমাত্র একতার অভাবে। সকল কার্য্যে একতা চাই। আমরা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে আসিয়াছি, আমাদের সেই কারণে এক উদ্দেশ্যে—এক লক্ষ্যে কার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত, তাহা হইলে দ্বেষ হিংসা স্বার্থপরতা সকল ঘুচিয়া গিয়া আমাদের কষ্ট নিবারণ হইবে। এই একত্র মিলন, একতান না বাঁধিলে, কখনও কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। সহস্র তারের সংঘর্ষে ও ঝঙ্কারে একটি সুর বাহির হইয়া একতানে সুরটি মিলিবে এবং সুরসমষ্টির ঝঙ্কারে এক বীণা বাজিবে, তবেই সেই একমেবাদ্বিতীয়ং এর সঙ্গীত পৃথিবীতে ধ্বনিত হইবে।

> 'একমেবাদ্বিতীয়ং ঋষিবাক্য পুরাতন
> পুনঃ কর কীর্ত্তন এই আর্য্য দেশে'

আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সহস্র লোকে একপ্রাণে এক গান গাহিয়া উঠিব। সহস্র তারের যোগে যে ঝঙ্কার উঠিবে তাহা যেন একযোগে বাজিয়া উঠে। একতা বাঁধিতে গেলে সকলের মনের লক্ষ্য একদিকে হওয়া চাই। একমনে একপ্রাণে, একবাক্যে, এক উদ্যমে, এক উৎসাহে কার্য্য করিলে তবে প্রতি গৃহে, প্রতি পরিবারে, প্রতি দেশে, প্রতি রাজ্যে—পৃথিবীর সকল স্থানে মঙ্গল স্থাপিত হইবে। এইরূপে পারিবারিক জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সুখ শান্তি লাভ হইবে। ইহা তো সকলেই জানেন যে একটি সমগ্র লাঠির উপর যেমন ভর দিয়া দাঁড়ান যায়, কিন্তু তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলে তাহার উপর আর ভার চলে না, সেইরূপ আমরা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া থাকিলে, আমাদের মনের বিচ্ছিন্নতা দূর না হইলে, একদিকে লক্ষ্য না করিয়া চলিলে, কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। এই মঙ্গলোদ্দেশে কাজ করিবার একটি উপায় অবলম্বন করা চাই। ধর্ম্মভিত্তি ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, সকল কার্য্য ধর্ম্মভাবে পরিপূরিত করিয়া, ধর্ম্ম-অসি কোমরে বাঁধিয়া জগতে অগ্রসর হইতে হইবে। হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ রোপিত হইলে তাহা হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তাহা ধর্ম্মতেজে অসংখ্য সুফল প্রসব করিবে। আমরা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং এর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আলোক সকলে মিলিয়া লাভ করিব। এই আলোকময় ধর্ম্মসংযুক্ত একতা-বন্ধনে আমাদের হৃদয়ে প্রাণ আসিবে। ধর্ম্মই সকলের মূল। ধর্ম্মই চিরস্থায়ী, ধর্ম্ম ব্যতীত কিছুই স্থায়ী হয় না। ধর্ম্মই সকলের সম্বল। ধর্ম্মভিত্তির উপর যাহা করিবে তাহাই চিরস্থায়ী হইবে, তাহার মূল সুদৃঢ় হইয়া পরমেশ্বরের নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া চিরকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে। এই মূল মন্ত্র যিনি গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া চলিয়াছেন, তিনি সকল কাজে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারেন এবং নির্ভীকচিত্তে থাকিতে

সক্ষম হয়েন ও সকল কর্ম্মে জয়লাভ করেন। কোন কার্য্য ধর্ম্মভিত্তির উপর গঠিত না হইলে তাহা সুরক্ষিত হয় না। যে গৃহে আমরা বাস করি, তৈয়ারি হইবার পূর্ব্বে তাহার ভালরূপ ভিত্তি করিয়া লইতে হইয়াছে। ভালরূপ গৃহের ভিত্তি না হইলে যেরূপ পদে পদে আশঙ্কিত হইতে হয়, সেইরূপ মনুষ্যের মনে ধর্ম্মভাব না থাকিলে, ধর্ম্মের দ্বারা গোড়া বন্ধন না হইলে, সমূলে সে বিনাশ পায়। ধর্ম্মই মানুষের সাথী, ধর্ম্মই পুণ্য-পথের সোপান। ধর্ম্মই পুণ্যের আকর। যে গৃহে ধর্ম্ম নাই তাহা শ্মশান সমান হইয়া পড়ে গার্হস্থ্য-জীবনে সুখ দুঃখ সবই আছে; তাহাতেই আমাদের পরীক্ষা; ধর্ম্ম জীবনে সংযুক্ত না হইলে সকলই অশান্তি। এই জন্য গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নরনারীর সমভাবে বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা চাই। নরনারীর উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মসোপানে না উঠিয়া প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। যিনি যত বিদ্বান হউন না কেন, ধর্ম্মসংযুক্ত না হইলে বিদ্যা উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে না বা মনুষ্য সমাজে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মভাবে আমাদের হৃদয় জাগ্রত হয়, আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়, আলস্য ও ঔদাস্যভাব বিদূরিত হইয়া আমাদিগকে সতেজ করিয়া তোলে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া চলেন, ভগবানকে ভক্তিভরে নিত্য পূজা করেন, পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য তাঁহার নিকট সহজে প্রতিভাত হয়। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের অসীম দয়া অসীম স্নেহ অনুভব করিয়া, তাঁহার হস্তে বিশ্বসংসারের এই প্রজাপুঞ্জ যে কি প্রকারে লালিত পালিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করেন, তিনিই তাঁহার মঙ্গলময় ভাব বুঝিতে সক্ষম হয়েন। সেই বিশ্বপিতা—সেই অখিলমাতা ক্রোড়ে রাখিয়া স্নেহময় আলিঙ্গনে শিশুর মত এই বিশ্বসংসারকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার এই সকল মঙ্গলময় ভাব দেখিয়া আমাদের মোহ কি দূর হইবে না? আমাদের সুখের জন্য তিনি কি না প্রেরণ করিতেছেন? আমার অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রেরিত সকল বস্তু মনের তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিয়া যাই। ইহা সৎপুত্রের লক্ষণই নহে। পরমেশ্বর আমাদের পিতামাতার হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গলময় ভাব সকল প্রেরণ করিতেছেন; স্নেহ দয়া দিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে এতই আর্দ্র করিয়াছেন, যে কত শত পুত্র কত শত কঠিন দোষে লিপ্ত হইলেও তাঁহাদের ক্ষমার গুণে রক্ষা পাইতেছেন। পিতামাতার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া তাঁহাদের মনে কঠিন আঘাত দিলেও স্নেহশীল জনক জননী সন্তানদিগকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করিতেছেন। প্রতিনিয়ত দেখিতেছেন যে কিসে সন্তানের মঙ্গল হয়, কি প্রকারে তাহারা সুশিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক পিতামাতাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া জানিবে। তাঁহারা যেমন সন্তানগণের ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য সদাই চিন্তা করেন ও সেই মত কার্য্য করেন, সেইরূপ সন্তানগণেরও কর্ত্তব্য যে পিতামাতার মনে কোনরূপ আঘাত না দিয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিয়া সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখেন; তাঁহারা কোন কারণে ভর্ৎসনা করিলেও তাঁহাদের প্রতি রুক্ষভাবে বাক্যপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের মনে কোনরূপ কষ্ট না দেন। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি কত কষ্ট সহ্য করিতে আরম্ভ করেন, কত যত্ন-পরিশ্রমে ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনে সন্তানদিগকে লালন পালন করেন। সেই সন্তান ভাল হইলে তাঁহারা কত না প্রসন্ন ও আনন্দিত হয়েন, নিজের শোক দুঃখ সকলি ভুলিয়া যান। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সন্তান পিতামাতার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে সক্ষম হয় না। ভগবানকে স্মরণ ও চিন্তা করিলে তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া পিতামাতার আদেশ উপদেশ পালন করা, যাহাতে তাহাদের মনস্তুষ্টি হয়, সেইরূপ সাধন করা, পুত্রদিগের কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রত্যেক সন্তান সকল কর্ম্ম ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া চলিলে তাহারা পুণ্যময় জীবন লাভ করিয়া পৃথিবীতে সুখে দিনযাপন ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে।

ধর্ম্মভাব থাকিলে এই মনুষ্য সমাজে পরস্পরের উপর পরস্পরের ঘৃণা-দ্বেষ হিংসা-স্বার্থপরতা সকলই চলিয়া যায়। সকল মনুষ্য সত্যের অনুসরণে একের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। সকলেই সেই এক পথে একই লক্ষ্যে চলিতে থাকে। ধর্ম্মের উচ্চ শিক্ষার ফলে মনুষ্যসমাজে পার্থক্যভাব দূর হইয়া যায়, কেহ কাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না। ধর্ম্মের মূলই ভগবানের উপর প্রগাঢ় ভক্তি। ভক্তি ও প্রেমের বলে আমারা সকল বাধা অতিক্রম করিতে পারি, সকল পরিশ্রম তুচ্ছ মনে করিতে সমর্থ হই। এই যে আমরা সকলে এখানে মিলিত হইয়াছি, ইহা ভগবানকে প্রসন্ন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিবার জন্য। আমাদের এত উৎসাহ এত যত্ন, সে কেবল তাঁহার সেবক হইয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবার জন্য। ধর্ম্মের সেই দিব্যালোকে আমরা পবিত্র ও সতেজ হইয়া উঠিব। তিনি আমাদের মধ্যে অবস্থান না করিলে আমা-আমাদের শূন্য-হৃদয় কখনো পূর্ণ হইবে না। এই কোলাহল,—অশান্তির ভিতর কেবল তাঁহাকে পাইয়াই শান্তি লাভ করা যায়।

কোটি কোটি লোকের যিনি একমাত্র অধিপতি তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাই চল। মনের আবেগ প্রকাশ করিয়া বলি, তিনি সান্ত্বনা দিবেন। সকলই লোপ হবে, সকলই ধ্বংস হবে, কিন্তু ধর্ম্মের লোপ নাই—উহা চিরস্থায়ী। ধর্ম্মের সংস্পর্শে ব্যক্তিগত জীবন উন্নত হয়, ধর্ম্মমন্ত্রে জাতীয় জীবন গঠিত হয়। ধর্ম্মের কথা স্মরণ না করিলে আমরা আরও হীনতেজ হইব। যিনি অগণন প্রজা-পুঞ্জের সুখ-বিধানের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া আমরা কি করিতেছি? আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকের হাহাকার ক্রন্দনধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশও করে না। নিজের স্বার্থপরতা বশতঃ এমন হীন হইয়া পড়িয়াছি, পরনিন্দা পরচর্চ্চায় এমন ব্যাপৃত থাকি এবং বিলাসি-

তার মোহে এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি, যে পরোপকারে কি করিয়া ব্রতী হইব। পরের দুঃখে কাতর হইয়া পরোপকারে ব্রতী না হইলে আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? হে ভগবন্! আমাদের এমন শক্তি কি এমন বুদ্ধি নাই, যে তোমার মহিমা বুঝিয়া তাহা প্রচার করিব। তোমার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে আমরা হতবুদ্ধি হই। আমরা দুএকটি বাক্য প্রয়োগে তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া যে তোমাকে ধন্যবাদ দিব তাহাও যে হয় না—ভাষায় কুলায় না। আমার মত অজ্ঞ নারীর এই সজ্জন সমাগমে আসিবার সাহস কি প্রকারে হইল? এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্বে নরনারীকে সমভাবে কার্য্য করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করা চাই। এই পরস্পরের সাহায্যের উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ইহার জন্য নরনারীর সমভাবে শিক্ষা লাভের প্রয়োজন। এই দুর্দ্দিনে আমোদের লহরা একবার ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রত্যেকের দুঃখ ভাবিয়া কাজ করি আইস। তাহাতে আমাদের পরিশ্রম কত সহজ হইবে। আমরা ভগবানের কাছে কত সহায়তা পাইব। এমন চির সখা কোথায় আছে? আমরা যখন তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারিব তখন আমাদের জীবন সার্থক হইবে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া ধন্য হইব। এস আমরা সেই বিদ্যালয় খুলি, যেখানে সেই একের বীণা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া বাজাইতে পারিব, একের সঙ্গীত সকলে মিলিয়া গাহিতে পারিব, সেই একের স্তুতি-পাঠ করিয়া—শত সহস্র নাম লইয়া সমস্বরে তাঁহার বন্দনা করিব।

দেখিতে দেখিতে সুখে দুঃখে হাঁসিয়া কাঁদিয়া নানাবিধ জঞ্জালের মধ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আজ এই শুভ দিনে কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছি, তাই আজ আমাদের মহোৎসব। আমাদের পূজা লও, পিতা! তুমি ধন্যবাদ গ্রহণ কর। তুমিই আমাদের সৌহার্দ্দ্যভাব জাগাইয়া তুলিয়াছ। আমরা একবার প্রাণ ভরিয়া ভক্তিভরে সকলে সমস্বরে তোমাকে ডাকিব! আমরা তোমার নামে সকলে যে এখানে সমবেত হইয়াছি, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের আজ কত আনন্দ। তোমাকে স্মরণ করিয়া আমরা মোহমুগ্ধময় জগতের কোলাহল যেন ভুলিয়া যাইতেছি, যেন কোন স্বর্গলোকে আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর গত হইতেছে, আমাদের কি এমন করিয়াই মিথ্যা-জীবন অতিবাহিত হইবে? গত বৎসরের কি হিসাব দিলাম। তাঁহার নামে এই ধর্ম্মসভা সুশিক্ষা ও ধর্ম্মের প্রভাবে এমন উজ্জ্বলভাব ধারণ করুক, যে কাহাকেও ভগ্নোৎসাহে—ভগ্নহৃদয়ে যেন কখনো ফিরিয়া যাইতে না হয়। তাঁর জ্যোতি যেন সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়, তাঁর মহিমা যেন সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, তিনি জগৎ গুরু।

হে জগদীশ্বর! তুমি একবার আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হও, একবার আসিয়া আমাদের দেখা দাও; মনের ক্ষোভ দূর কর, একবার দেখা দিয়া অন্ধের আশা মিটাও। তুমি এই সভার প্রাণ। তুমি ইহাতে অবতীর্ণ হইয়া সকলের হৃদয় আকর্ষণ কর। তোমার আলোক বিতরণ করিয়া সকলকে সতেজ কর। তুমি আমাদের বিচ্ছিন্ন প্রাণকে এক কর।

বর্ষ-প্রবেশ।

বর্ষ এলো, বর্ষ গেল, নিয়তি তোমার,
সুমঙ্গল পাঞ্চজন্য বাজিল আবার
প্রকৃতির ঘরে ঘরে, নব অনুরাগে
ভরিয়া উঠিল বিশ্ব নবীন সোহাগে,
পত্র পুষ্প মহীরুহ মুখরিত সব
সৌন্দর্য্য পরশে লভি প্রাণ অভিনব,
জীবন শোভায় সুখ মন্দাকিনী ঝরে—
বরষের শোক তাপ নব আশা ধরে,
কি আশা হৃদয়ে লয়ে দাঁড়াইব আমি
কহি দেও বর্ষসনে ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী?
কোথা আশা, কোথা শান্তি, কোথায় আপনা
ভুলিবার শক্তি, পাব শোকের সান্ত্বনা?
এ শূন্য হিয়ার মাঝে বিশ্বাস আলোকে
আনিয়া দেখায়ে দেও সেই পুণ্যলোকে,
যেথানে দেহান্ত পরে পাইব তাহার
তোমার কল্যাণময় রহস্য বিধার।
সেই আশা সেই শান্তি সেই সে প্রত্যয়
দৃঢ় করি দেও মন, জীবনে সঞ্চয়
করিবারে পারি, যেন বিশ্বাস মহান
তোমাতে নির্ভর করি পাই নব প্রাণ,
কর্ম্মযোগে বাঁধি হিয়া বিশ্বের দুয়ারে—
দাঁড়াইয়া, তব কার্য্য সাধি অকাতরে,
নাহি ক্লান্তি নাহি শোক নাহি দুঃখ লেশ
আনন্দে আনন্দময়, জীবনের শেষ
এই ভরসায় নববর্ষের উৎসবে
আসিয়াছি আপনাকে বিলাইতে ভবে।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী।

নানা কথা।

নবদ্বীপ।—বিগত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের Calcutta University magazine নামক পত্রে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নবদ্বীপের সুবিখ্যাত চতুষ্পাঠীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রঘুনাথ শিরোমণি কর্ত্তৃক উক্ত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হয়। খৃষ্টীয় ১১০৩ সালে নবদ্বীপে মহারাজা লক্ষণ সেন আসিয়া বাস করেন। ভাগীরথীর সহিত জলঙ্গীর সঙ্গমস্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে উক্ত রাজভবনের সামান্য ভগ্নাবশেষ এখনও পরিলক্ষিত হয়। ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খিলিজির নিয়োজিত কাজির হস্তে নবদ্বীপের শাসন ভার অর্পিত হয়। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমান প্রভুত্ব নবদ্বীপে অক্ষুণ্ণ ছিল। এই মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়েই নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য সুবিখ্যাত হইয়া উঠে। নবদ্বীপের প্রতিপত্তি জন্মিবার পূর্ব্বে বিক্রম-শিলায় বৌদ্ধগণের এবং

মিথিলায় হিন্দু-ব্রাহ্মণগণের এই দুইটি সুবৃহৎ চতুষ্পাঠী ছিল। ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খিলিজি বিক্রমশিলার চতুষ্পাঠীর ধ্বংস-সাধন করেন। মিথিলার চতুষ্পাঠীর গৌরব বজায় রাখিবার জন্য তথায় কেবল শিক্ষাদানেরই ব্যবস্থা ছিল। দর্শনশাস্ত্রের কোন পুঁথি বা অধ্যাপক প্রদত্ত শিক্ষার মর্ম্মার্থ ছাত্রমণ্ডলীর কেহই চতুষ্পাঠীর বাহিরে লইয়া যাইতে পারিতেন না, বিদেশীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা যে এক বিষম বিড়ম্বনা তাহা বলা বাহুল্য। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা চতুষ্পাঠীতে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া তত্বচিন্তামণি এবং কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন এবং তথায় চতুষ্পাঠী খুলিয়া দেন। তাঁহার প্রতিভা শ্রবণে দেশদেশান্তর হইতে ছাত্রগণ সমবেত হইতে থাকে। কিন্তু তখনও নবদ্বীপের বিশেষ গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মিথিলাকে পরাভব করিতে পারে, এমন একজন অসাধারণ পাণ্ডিতের তখনও অভাব ছিল। বাসুদেবের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি ছাত্র-রূপে মিথিলায় গমন করেন। তথাকার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক গঙ্গাধর একদিন রঘুনাথের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া, রঘুনাথকে সর্ব্বসমক্ষে অবমাননা করেন। রঘুনাথ তাহাতে এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, যে রাত্রিকালে মিথিলার ঐ অধ্যাপকের প্রাণবিনাশ করিবার জন্য অসিহস্তে বহির্গত হন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মিথিলার ঐ অধ্যাপক পত্নীর সহিত গৃহছাদে শয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ তথায় গিয়া উপস্থিত। দম্পতির আলাপ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। রঘুনাথ লুক্কায়িত ভাবে অদূরে দাঁড়াইলেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন চন্দ্রের সমান শোভনতম বস্তু জগতে কি আর কিছু আছে? স্বামী বলিলেন, চন্দ্রের মত বা তাহা অপেক্ষাও সুন্দর সামগ্রী আজ সন্দর্শন করিয়াছি। বঙ্গদেশ হইতে একজন যুবা দার্শনিক আসিয়াছেন। তিনি আজ আমাকে তর্কে পরাজয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা চন্দ্র অপেক্ষাও বিমলতর। রঘুনাথ যখন ইহা শুনিতে পাইলেন, তরবারি আপনা হইতে তাঁহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। তিনি আনন্দে ছুটিয়া গিয়া বিস্মিত ও ভয়বিহ্বল গঙ্গাধরের পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাধর অভয় দিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন, এবং পরদিন প্রভাতে সর্ব্বসমক্ষে রঘুনাথের নিকট তর্কযুদ্ধে নিজ পরাজয় স্বীকার করিলেন। সে আজ ১৫০৩ সালের কথা। ঐ সময় হইতেই নবদ্বীপের বিখ্যাত চতুষ্পাঠীর জন্মদিন পরিগণিত হইয়া থাকে। রঘুনাথ ১৫০৭ অব্দে ৭০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দুই তিন বৎসর হইল আমরা নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী দেখিয়া আসিয়াছি। মান্দ্রাজ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, পশ্চিমাঞ্চল, উড়িষ্যা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেকগুলি ছাত্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। অধ্যাপকের মধ্যে দেখিলাম একজন পঞ্জাবী। তিনি এক্ষণে বার্দ্ধক্য সীমায় প্রায় সমুপস্থিত। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন বাল্যে ছাত্র হইয়া এইখানে আসিয়াছিলাম; অধীতবিদ্য হইলাম; কিন্তু এখানকার মায়া ছাড়াইতে পারিলাম না। এইখানেই অধ্যাপনা করিতেছি। তিনি বলিলেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক চতুষ্পাঠী আছে। কিন্তু নবদ্বীপে আসিয়া দর্শনের শেষ শিক্ষা লাভ না করিলে পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভের অভাব রহিয়া যায়। তাই দর্শনশিক্ষার্থী সমগ্র ভারতের লক্ষ্য নবদ্বীপের দিকে। হিন্দী জানা থাকায় নবাগত বিদেশীয় ছাত্রগণের তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের বিশেষ সুবিধা আছে। পঞ্জাবী অধ্যাপকের বঙ্গপ্রীতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঋষি-কুমার তুল্য সমাগত ছাত্রবর্গের অমায়িক পরিচ্ছদে এবং অনেকের গৈরিক বসনে এবং সর্ব্বশেষে তাহাদের সারল্য-পূর্ণমুখশ্রীতে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য্যের ভাব পূর্ণমাত্রায় বিকশিত দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই লজ্জা ও ক্ষোভের উদ্রেক হইল। বুঝিলাম, জনসাধারণ নবদ্বীপের এই উজ্জ্বলতম কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য সেরূপ মুক্তহস্ত নহেন। গবর্ণমেণ্টের সামান্য সাহায্যে চতুষ্পাঠীর ক্ষীণ প্রাণ রক্ষা করিতেছে।

১৮২৯শকের আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৩৲
" " গোবিন্দলাল দাস	"	৬৲
" সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী	ধানবাড়ী	১৬৷৹
" কুমার হৃষিকেশ লাহা বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মল্লিক	"	৩৲
" " শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য	"	৩৲
" " বৃন্দাবন দাস	মেদিনীপুর	২৲
" " মুকুন্দানন্দ আচার্য্য	ডেরাডুন	১৬৮/
" " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	কুচবেহার	৫৲
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী	পুটিয়া	৩৷৵৹
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বড়াল	দিনাজপুর	৩৵৹
" " নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর	
" " বনমালী চন্দ্র	কলিকাতা	৩৲
" " রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	বেহালা	২৲
" " রাধাকান্ত আইচ	?	৫৲
" " ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	সজ্জনকান্দা	১০৲
শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	বালীগঞ্জ	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
" " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	"	৩৲
" সেখ মনসুরাল হক্	বনথালা	৩৷৹
" বাবু জগচ্চন্দ্র নাথ	কৃষ্ণনগর	১০৲
" " গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী	গড়ড়া	৩৷৵৹
" " নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়	সিলেট্	৩৲
" " এস, কে, লাহিড়ী	কলিকাতা	৩৲
" " দিগম্বর দত্ত	ক্ষীরপাই	৪৲
" গোবিন্দচন্দ্র জাওয়াল	দিক্‌বাজার	৩৲
" " কালীদয়াল ঘোষ	ঢাকা	৩৲
" " গণেশপ্রসাদ লালা	দ্বারভাঙ্গা	৩৷৵৹
" " শ্রীশচন্দ্র মল্লিক	আন্দুল	৩৲
" " ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী	ভবানীপুর	১৷৹

শ্রীযুক্ত বাবু সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী কুমিল্লা ২॥৵০
" " ক্ষীরনারায়ণ দাস সরকার আলতাগ্রাম ৩।৵০
" " দ্বারকানাথ রায় কলিকাতা ৩৲
" " দেবেন্দ্রনাথ রায় " ২৲
" " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় হালিসহর ৬৻০
" " প্যারীমোহন রায় কলিকাতা ৪৲
" " গোষ্টবিহারী চট্টোপাধ্যায় " ৩৲
রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভুঞ্জ দেও বহাদুর ময়ূরভঞ্জ ২০৲
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা ৩৲
" " ললিতমোহন রায় " ৻০
" " হৃদয়চন্দ্র আচার্য্য কাউরেড ২।৵০
" " মাধবচন্দ্র চন্দ্র খিদিরপুর ৩৲
" " নীলমণি মান্না বেহালা
" " তুলসীদাস দত্ত কালীঘাট ৩।৵০
" মৌলভি বিলাইৎ হোসেন কলিকাতা ৩৲
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ রামপুরহাট ১৸৵০
" বাবু নরনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲
" " কালীপ্রসন্ন ঘোষ " ৩৲
" " কানাইলাল শেঠ " ৩৲
" " মহেন্দ্রনাথ সেন ধুবড়ী ৫৲
" রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর কলিকাতা ৩৲
" " পঞ্চানন মিশ্র দ্বারিকাপুর ২৲
" " কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া শিলং ১০৲

২২৬৻০

দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত সাহায্য প্রাপ্তিস্বীকার।

গত ২৬শে চৈত্র ১৮২৯ শক উপাসনান্তে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উপস্থিত নিয়মিত উপাসকবর্গের নিকট হইতে পাওয়া যায়— ১০৸৵০

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৲
" " আশুতোষ চৌধুরী ১০৲
" " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৲
" " হরিহর মুখোপাধ্যায় ৫৲
" " হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৪৲
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ৫৲
" স্বর্ণকুমারী দেবী ২৲
" হিরন্ময়ী দেবী ২৲
" ইন্দিরা দেবী (আসানসোল) ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ২৲
শ্রীমতী নলিনী দেবী ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জ বিহারী ধর ২৲
" " নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৲
" " ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ১৲
" " চারুচন্দ্র মিত্র ১৲
" " ভগবতীচরণ মিত্র ১৲
" " প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী ১৲
" " জগবন্ধু রায় ১৲
" " মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
" " রাখাল রঞ্জন রায় ১৲
" " ক্ষীরোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় ১৲
" " ঠাকুরদাস মল্লিক ১৲
" " গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৷০
" " যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ॥০
" " বিপিনবিহারী দে ॥০
" " মদনগোপাল ঘোষাল ।০
" " নরেন্দ্রকুমার মল্লিক ।০
" " বিহারীলাল রায় ৴৬

৯১০৵৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে বার বার পত্র লেখা সত্ত্বেও যাঁহারা বহুদিনের পত্রিকার বক্রী মুল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া এই জ্যৈষ্ঠ মাহার মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। অথবা কি প্রকার বন্দো-বস্ত করিলে তাঁহাদের দেয় টাকা দিবার সুবিধা হয় তাহাও এই মাসের মধ্যে এক-খানি পোষ্টকার্ডে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠঃপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসারিক উৎসব হইবে। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগদান করিবেন ইতি।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
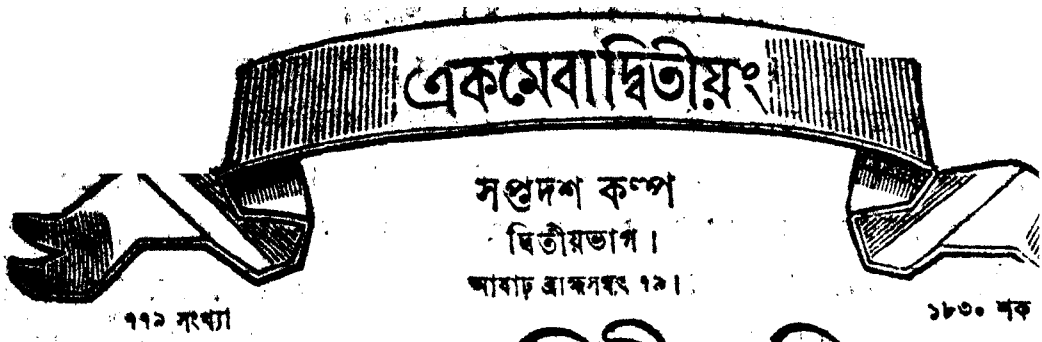
মার্কস্ অরিলিয়সের আত্ম-চিন্তা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১। আমাদের স্মরণ করা উচিত, জীবন ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই উহার অল্প অংশ অবশিষ্ট থাকিতেছে; এবং সেই সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যদি মানুষের পরমায়ু এখনকার অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন সমান চালে চলিতে পারিত কি না, কাজ করিবার বুদ্ধি থাকিত কি না, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় চিন্তা করিবার শক্তি থাকিত কি না, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই। কেন না, একথা সত্য, মানুষ জরাগ্রস্ত হইলেও তাহার প্রাণী-শরীরের ক্রিয়াগুলি চলিতে থাকে; সে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, তাহার দেহ পুষ্ট হইতে পারে, তাহার কল্পনা থাকিতে পারে, তাহার প্রবৃত্তি বাসনাদি থাকিতে পারে; কিন্তু জীবনের সদ্ব্যবহার করা, পূর্ণমাত্রায় কর্ত্তব্যসাধন করা, বুদ্ধিবিবেচনার সহিত কাজ করা, ন্যস্ত ও অন্যস্ত বিচার করিয়া দেখা,—এসমস্ত বিষয়ের পক্ষে সে মৃত বলিলেও হয়। অতএব আমাদিগকে খুব দ্রুত পদে চলিতে হইবে, সমস্ত কাজ যত শীঘ্র পারি গুছাইয়া লইতে হইবে; কেন না, মৃত্যু ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে; তাছাড়া, কখন কখন, আমাদের পূর্ব্বেই আমাদের বুদ্ধির মৃত্যুদশা উপস্থিত হয়।

২। নৈসর্গিক বস্তুর যাহা কিছু নৈসর্গিকভাবে ঘটে তাহাই মনোহর ও আনন্দপ্রদ। ডুমুর যখন খুব পাকিয়া উঠে, তখন আপনা হইতেই তাহার মুখ খুলিয়া যায়; জলপাইগুলা যখন পাকিয়া ভূতলে পতিত হয় তখন তাহাদিগকে কেমন সুন্দর দেখায়। ধান্য-শীষের বাঁকিয়া-পড়া, সিংহের ভ্রুকুটি, ভল্লুকের ফেন-ফুৎকার—এ সমস্ত যদি এক-এক করিয়া পৃথক্‌ভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে উহাদিগকে সুন্দরের বিপরীত বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহাদিগকে যদি বিশ্বপ্রকৃতির কার্য্য বলিয়া দেখা যায় তবে উহাই সুশোভন ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। এইরূপ মার্জ্জিত দৃষ্টিতে দেখিলে, ফুটন্ত যৌবনের ন্যায়, বার্দ্ধক্যের পরিপকতার মধ্যেও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা

যায়। অবশ্য, এ সৌন্দর্য্য সকলেই দেখিতে পায় না, যাহারা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সুর মিলাইয়া তন্ময় হইয়াছে তাহারাই এই সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।

৩। যে হিপক্রিটিস্ কত রোগ সারাইয়াছেন, শেষে তিনি নিজেই পীড়িত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। যে চ্যাল্ডীয় জাতি অন্যের মৃত্যু গণনা করিত, অবশেষে তাহাদের নিজেরই সেই দশা উপস্থিত হইল। অ্যালেক্জাণ্ডার, পম্পে, জুলিয়াস সীজার, কত নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন, শেষে তাঁহারাও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালানলে ভস্মীভূত হইবে বলিয়া যে হিরাক্লিটস কত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাঁহার জলজনিত উদরী রোগে মৃত্যু হইল। ডেমক্রিটস্কে পোকায় খাইল; আর একপ্রকার কীট সক্রেটিস্কে বিনাশ করিল। এই সকল দৃষ্টান্ত কিসের জন্য? দেখ; তোমরা জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে পার হইয়াছ, বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছ; ইতস্ততঃ না করিয়া এইবার তবে জাহাজ হইতে নামিয়া পড়। যদি আর এক জগতের ডাঙ্গায় আসিয়া নামিয়া থাক,—তাহাতে ভয় নাই, সেখানে অনেক দেবতা আছেন, তাঁহারা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; আর যদি তুমি শূন্য নাস্তিত্বের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া থাক তাহাতেই বা কি? তাহা হইলে তুমি ত সুখ দুঃখের হাত হইতে একেবারেই নিষ্কৃতি পাইলে। তাহা হইলে দেহরূপ বহিরাচ্ছাদনের জন্য আর তোমাকে গাধার খাটুনি খাটিতে হইবে না। যে যে-পরিমাণে যোগ্য, তাহার বহিরাচ্ছাদনটি সেই পরিমাণে অযোগ্য; কেন না, একটি আত্মময়, জ্ঞানময়, দেবপ্রকৃতি;—আর একটি, ধূলা আবর্জ্জনা বই আর কিছুই নহে।

৪। অন্যের সহিত যেখানে তোমার স্বার্থ সমান সেই স্থল ছাড়া আর কোন স্থলেই অন্যের বিষয় লইয়া তোমার মনকে ব্যাপৃত রাখিবে না। পরচর্চ্চায় মন দিলে—অর্থাৎ অপরে কি কথা বলিতেছে, কি ভাবিতেছে, কি ফন্দি করিতেছে, কি মৎলবে কি কাজ করিতেছে—এই সমস্ত বিষয় ভাবিতে গেলে, আপনাকে ভুলিয়া যাইতে হয়,—আপনার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব নিরর্থক কোন বিষয়ে আপনার মনকে ব্যাপৃত রাখিবে না, কিংবা তোমার চিন্তার প্রবাহের মধ্যে আর কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা আনিয়া ফেলিবে না। বিশেষতঃ এইরূপ অনুসন্ধানে অযথা কৌতূহল ও দ্বেষহিংসা বর্জ্জন করিবে। অতএব যাহার বিষয়ে তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি মন খুলিয়া প্রকাশ করিতে পার না এমন সকল চিন্তা হইতে বিরত হইতে অভ্যাস করিবে। তুমি যাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে, তাহাতে অকাপট্য, সদ্ভাব, সাধারণের শুভচিন্তা ভিন্ন আর কিছুই যেন স্থান না পায়; তাহার মধ্যে যেন কোন প্রকার খেয়াল-কল্পনা, দ্বেষ, অসূয়া কিংবা অন্যায় সন্দেহের ভাব না থাকে। অর্থাৎ এমন কোন কথা বলিবে না যাহা বলিতে লজ্জা হয়। যিনি সাধনার দ্বারা এইরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তিনি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদের নিয়োজিত একপ্রকার আচার্য্য ও পুরোহিত; তাঁহার অন্তরে যে দেবতা অধিষ্ঠিত তিনি সেই দেবতার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। সেই দেবতার সাহায্যেই তিনি সংরক্ষিত; সুখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, দুঃখ তাঁহার হৃদয়কে ভেদ করিতে পারে না, তিনি সুখের স্পর্শে অনাকৃষ্ট, দুঃখের বাণে দুর্ভেদ্য, তাঁহার

কেহই অনিষ্ট করিতে পারে না, তিনি দুষ্ট লোকের দ্বেষ হিংসার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এইরূপে অন্তরের রিপুগণকে দমন করিবার জন্য তিনি নিয়তই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; এবং ন্যায়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহার ভাগ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে তিনি তাহা অম্লান বদনে গ্রহণ করিতেছেন। সাধারণের প্রয়োজন ও হিতের জন্য আবশ্যক না হইলে, তিনি অন্যের বাক্য, চিন্তা ও কার্য্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। তিনি আপনার কাজ লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, এবং বিধাতা তাঁহাকে যেরূপ অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সকল পালন করেন। তিনি ভাবেন তাঁহার ভাগ্য যখন তাঁহার উপযোগী, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপযোগী। তিনি বিবেচনা করেন, জ্ঞানের মূলতত্ত্বটিই সকল মনুষ্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, এবং ভূতদয়া ও সমস্ত জগতের ইষ্টচিন্তা, মানব-প্রকৃতিরই একটি অংশ। যাঁহারা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিল করিয়া জীবন যাপনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও প্রশংসার কোন মূল্য নাই। যাহারা নিজেকেই সুখী করিতে পারে না, তাহাদের প্রশংসা অপ্রশংসার আবার মূল্য কি?

৫। অনিচ্ছুক হইয়া, স্বার্থপর হইয়া, পরামর্শ না করিয়া, কিংবা মনের আকস্মিক আবেগে কোন কাজ করিবে না। অদ্ভুত ধরণধারণ কিংবা রসিকতা প্রকাশ করিবারও চেষ্টা করিবে না। যতটা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা বেশী কথা কহিবে না, অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। তোমার যে অন্তর্দেবতা তোমার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সাবধান তুমি যেন তাঁহার বিশ্বাস না হারাও। তুমি যদি পুরুষ হও তো ঠিক পুরুষের মতন, যদি স্ত্রীলোক হও তো ঠিক্ স্ত্রীলোকের মতন, তোমার যে বয়সই হউক ঠিক্ সেই বয়সের মতন আচরণ করিবে। পূর্ব্ব হইতেই এমন ভাবে লোকের নিকট তোমার বিশ্বাস ও পসার বজায় রাখিবে যে, হিসাব নিকাশের ছাড় চাহিবার সময়ে যেন তোমার শপথ করিতে না হয়—খরচের স্বাক্ষর-নিদর্শন দেখাইতে না হয়। তোমার মুখ যেন সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকে। বাহ্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিবে না, কিংবা অপরের নিকট হইতে শান্তি যাচ্ঞা করিবে না। এক কথায়—যষ্টির উপর ভর দিয়া থাকিবার জন্য আপনার পা দুটাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে না।

৬। সমস্ত মানব-জীবন-ক্ষেত্র খুঁজিয়া তুমি যদি এমন কিছু পাও যাহা ন্যায় ও সত্য হইতে, মিতাচার ও ধৈর্য্য হইতে, সদাচার-জনিত আত্মপ্রসাদ ও বিধাতার হস্তে আত্মসমর্পণ-জনিত চির-সন্তোষ হইতে অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে আমি বলি, তুমি তাহাকেই উত্তম মনে করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই দিকে গমন কর। কিন্তু, যে দেবতা তোমার অন্তরে নিহিত, যিনি তোমার প্রকৃতি ও বাসনা-সমূহের প্রভু, যিনি তোমার মনের ভাব পরীক্ষা করিতেছেন এবং যিনি (সক্রেটিস এই কথা বলিতেন) আপনাকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি দেবতাদের শাসন মানিয়া চলেন, যিনি সমস্ত মানব জাতির শুভ কামনা করেন, সেই অন্তর্দেবতা অপেক্ষা মূল্যবান জিনিস যদি তোমার আর কিছুই না থাকে, যদি আর সমস্তই ইহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে আর কাহারও হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিও না। কেন না,

যদি আর কোন দিকে তুমি ঝুঁকিয়া পড়, তাহা হইলে, যাহা তোমার প্রকৃত মঙ্গল তৎপ্রতি তোমার অ-বিভক্ত মন প্রয়োগ করিতে পারিবে না; কেন না যাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও যাহা ভিন্ন জাতীয়—এরূপ কোন জিনিস্‌কে (যেমন, লোক-প্রশংসা, ধন ঐশ্বর্য্য সুখ ইত্যাদি) যুক্তি-সঙ্গত ও রাষ্ট্র-সঙ্গত প্রকৃত মঙ্গলের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতে দেওয়া উচিত নহে। এই সকল জিনিস যদি একবার মনোরঞ্জন করিতে আরম্ভ করে তবে আর রক্ষা নাই, ক্রমে উহারা প্রবল হইয়া মানুষের সমস্ত মনকেই বিকৃত করিয়া ফেলে। অতএব তোমার সমস্ত মনের ঝোঁক্ যেন একদিকেই যায়, যাহা সর্ব্বোত্তম সেই দিকেই যেন তোমার মন ধাবিত হয়। যাহা হিতকর তাহাই সর্ব্বোত্তম। বুদ্ধি-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে যাহা হিতকর বিবেচনা করিবে তাহাই দৃঢ়হস্তে ধরিয়া থাকিবে, কিন্তু যদি উহা শুধু পাশব জীবনের পক্ষেই ইষ্টজনক হয়,—তখনই উহা ত্যাগ করিবে, এবং ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থির বুদ্ধির সহিত বিচার করিয়া দেখিবে। কিন্তু সাবধান, অনুসন্ধানে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়।

(ক্রমশঃ)

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ-ভঞ্জন।

গতবারে আপনাদিগকে উপনিষদ হইতে একটি আখ্যায়িকা বলিয়াছিলাম তাহাতে ব্রহ্মশক্তির ব্যাখ্যা ছিল; এবার ঐ ধরণের আর একটি আখ্যায়িকা বলিব তাহাতে প্রাণশক্তির মাহাত্ম্য দর্শিত হইয়াছে। প্রথম আখ্যায়িকার বিষয় দেবতাদিগের বিবাদ-ভঞ্জন; এই আখ্যায়িকাটি ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ-ভঞ্জন—এই নামে অভিহিত হইতে পারে।

একদা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের, পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল, ইহারা প্রত্যেকে আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ, এই বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। চক্ষু বলিতে লাগিল, আমি কম কিসে? আমিই সকলের প্রতিষ্ঠা, আমি না থাকিলে লোকেরা দিশাহারা হইয়া অপথে পদার্পণ করে।

চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা

কর্ণ বলিল, আমি সম্পদ, সকল সম্পদের কারণ আমিই। আমার প্রসাদে লোকে বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা কর্ম্মশীল হইয়া সম্পদবান্ হয়।

শ্রোত্রং বাব সম্পৎ

রসনা বলিল, আমি বসিষ্ঠ—ঐশ্বর্য্যবান্। বাগ্মিরাই স্বীয় বাগ্মিতাগুণে অন্যকে বশ করিয়া ঐশ্বর্য্যবান্ হয়।

বাগ্বাব বসিষ্ঠা।

মন বলিল, আমি আয়তন, সকলের আশ্রয় স্থান। আমার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ সুনিয়মে চলে নহিলে তাহারা বিভ্রান্ত ও নানাদিকে ধাবিত হইয়া বিপদগ্রস্ত হয়।

মনো বা আয়তনম্

প্রাণ বলিল, আমা হইতে তোমরা সকলই পাইয়াছ, আমিই শ্রেষ্ঠ।

অহং শ্রেয়ানস্মি অহং শ্রেয়ানস্মীতি।

এইরূপে চক্ষু কর্ণ বাক্য মন স্ব স্ব প্রাধান্য জ্ঞাপন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাহা জানিবার জন্য তাহারা প্রজাপতির নিকটে গিয়া বিচারপ্রার্থী হইল। প্রজাপতি বলিলেন,—

যস্মিন্ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি।

তোমাদের মধ্যে যে না থাকিলে শরীর মৃতবৎ ঘৃণিষ্ট হইয়া উঠে, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

প্রজাপতির কথামত ইহারা একে একে দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

সা হ বাগুচ্চক্রাম

প্রথম বাক্‌, দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। একবৎসরান্তে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—

'কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি ?'

তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত ছিলে ?

তাহারা উত্তর করিল—

যথা কলা অবদন্তঃ

যেমন মূকেরা জীবিত থাকে, কেবল কথা কহে না কিন্তু চক্ষে দেখে, কর্ণে শুনে, প্রাণে নিশ্বাস ফেলে, মনে মনন করে, আমরা সেইরূপে জীবিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া রসনা দেহে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল। পরে,

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম

চক্ষু চলিয়া গেল। সম্বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি ?'

আমার অভাবে তোমরা কি প্রকারে জীবিত ছিলে ?

তাহারা উত্তর করিল—

যথা অন্ধা অপশ্যন্তঃ

যেমন অন্ধেরা জীবিত থাকে, কেবল চোখে দেখে না কিন্তু কানে শুনে, মুখে বাক্য উচ্চারণ করে, মনে ভাবে, প্রাণে শ্বাসপ্রশ্বাস বহন করে, আমরা এইরূপে জীবিত ছিলাম। তখন চক্ষুও দেহে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল। পরে,

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম

শ্রোত্র গেল। সম্বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি ?

আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত ছিলে ?

তাহারা উত্তর করিল—

যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ

যেমন বধিরেরা জীবিত থাকে, কেবল কাণে শুনে না কিন্তু চোখে দেখে, মুখে বাক্য বলে, প্রাণে শ্বাসপ্রশ্বাস বহন করে, মনে মনন করে, আমরা এইরূপে জীবিত ছিলাম। শ্রোত্র দেহে পুনঃপ্রবেশ করিল।

তৎপরে মন চলিয়া গেল। সম্বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি ?

আমার অভাবে কিরূপে জীবিত ছিলে ?

উত্তর,

যথা বালা অমনস্তঃ

অপ্রৌঢ়মনা বালকেরা যেমন জীবিত থাকে, চোখে দেখে, কাণে শুনে, মুখে বলে, প্রাণে নিঃশ্বাস ফেলে, কেবল মনোবৃত্তি সকল অপরিস্ফুট থাকে, আমরাও সেইরূপে জীবিত ছিলাম। ইহা শুনিয়া মন দেহে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল।

এইরূপে ইহারা জানিতে পারিল যে ইহাদের কাহারও অভাবে দেহ একেবারে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট বিকল হইয়া পড়ে নাই।

অনন্তর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। মহাতেজী সিন্ধু ঘোটক যেমন তাহার পাদ-বন্ধন-শঙ্কু উৎপাটন করত গমনোদ্যত হয় সেইরূপ অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাণ আপনার সঙ্গে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল—তখন সকলে ত্রস্ত হইয়া একবাক্যে নিবেদন করিল, প্রভো আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইও না, তোমা বিনা আমরা মুহূর্ত্তকাল জীবনধারণ করিতে পারি না। তুমিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অথ হৈনং বাগুবাচ

ইহাঁকে বাক্য বলিল—

যদহং বসিষ্টোঽস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্টোঽসীতি।

আমি যদি ঐশ্বর্য্যবান্ হই, সে তোমারই ঐশ্বর্য্য।

অথ হৈনং চক্ষুরুবাচ

চক্ষু বলিল—

যদহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠাঽসীতি।

আমি যদি প্রতিষ্ঠাবান হই, সে তোমারই প্রতিষ্ঠা।

অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ

শ্রোত্র বলিল—

যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎ সম্পদসীতি।

আমি যদি সম্পদবান্ হই সে সম্পদ তোমারই।

অথ হৈনং মন উবাচ।

মন বলিল—

যদহং আয়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি।

আমি যদি আশ্রয়স্থান হই, তুমিই সেই আশ্রয়।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্য ইহারা স্ব স্ব প্রধান নহে, প্রাণই ইহাদের আশ্রয়—ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

প্রাণের শ্রেষ্ঠতা কিসে?

প্রাণ শ্রেষ্ঠ, কেন না প্রাণশক্তি হইতেই দেহের উৎপত্তি। এই প্রাণশক্তিই ক্রমে রস রক্তাদির পরিচালনা করত চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় স্থানগুলি গড়িয়া তোলে। এই স্থানগুলি নির্ম্মিত হইবার পর, সেই সকল স্থানের আশ্রয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি এই সাধারণ প্রাণশক্তির উপরেই নির্ভর করে। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার সাধারণ আশ্রয়—প্রাণ। এই প্রাণ কোথা হইতে আসিল? সেই এক বিশ্বব্যাপী প্রাণ-শক্তিই ইহার উৎপত্তি স্থান। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই এক মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ-এজতি নিঃসৃতং।

এই জগতে যাহা কিছু, বৃহৎ হইতে বৃহৎ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, সকলের মধ্যেই এই প্রাণশক্তি কার্য্য করিতেছে। এই প্রাণশক্তি পরিণত হইয়া সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র তারা রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রাণশক্তি দ্বারা নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র বক্ষে প্রবেশ করিতেছে, সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে উৎফুল্ল হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, বসুন্ধরা ধন ধান্যে পূর্ণ হইতেছে, বৃক্ষ পল্লবিত হইতেছে, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ আহার বিহার করত জীবন ধারণ করিতেছে। এই মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া মনুষ্য সকল দেহ রক্ষার বিবিধ উপায় চেষ্টা করিতেছে, নগর গ্রাম বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিতেছে, স্নেহ-প্রেম দয়াধর্ম্মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

প্রাণ দেহের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চরিত হইয়া কেমন অলক্ষিত ভাবে তাহাদের হিতের জন্য কার্য্য করে। প্রাণের এই কার্য্য ত্যাগধর্ম্মের আদর্শ। প্রাণের শ্রেষ্ঠতা ত্যাগে। সে আপনার জন্য কিছুই রাখে না। সমুদয় দেহে সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আপনাকে বাঁটিয়া দিয়া সে আপনি অন্তরালে রহিয়াছে। এই প্রাণের যিনি প্রাণ—মহাপ্রাণ তিনিও সেইরূপ আপনি নির্লিপ্ত ভাবে আপনার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকল লোকের সকল জীবের

কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন। তিনি নিজে কিছুই চাহেন না, কিছুই ভোগ করেন না, কেবলই দান করিতেছেন, জীব ফল ভোগ করিতেছে, তিনি নিরশন থাকিয়া সকল দেখিতেছেন।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।

পশু পক্ষী এই প্রাণ স্বরূপকে না জানিয়া কার্য্য করিতেছে—হে মানব! তুমিও কি মূঢ় জীবের ন্যায় তাঁহাকে না জানিয়া আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিবে? আত্মসুখে রত থাকিয়া তোমার প্রাণদাতা, তোমার আশ্রয় দাতাকে ভুলিয়া থাকিবে? তাহা হইলে দেখিবে তোমার 'মহতী বিনষ্টিঃ'। এই ঋষিবাক্য মনে রাখিবে

ন চেদবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ

হে মানব, তুমি তাঁহাকে জানিবার অধিকার পাইয়াছ সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইও না। তাঁহাকে জান, অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর, তিনি প্রাণের প্রাণ, অমৃতের সেতু—

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতু:—

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের

অনুবৃত্তি।

যে কোন প্রকার নীতিতন্ত্র হউক না, তাহাতে আচরণ সংক্রান্ত নিয়মের কথাই থাক্ বা কেবলমাত্র সাদাসিধা উপদেশের কথাই থাক্, প্রকারান্তরে সকল নীতিতন্ত্রই স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। যখন স্বার্থের নীতি, উপযোগীর নিকট মনোজ্ঞকে বলিদান করিতে উপদেশ দেয়, তখন মনে হয় যেন একথাটাও মানিয়া লয় যে, তাহার সেই উপদেশ অনুসরণ করায় কিংবা না করায় মানুষের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে কোন একটা তথ্য স্বীকার করিলেই হয় না, সেই তথ্য স্বীকার করিবার অধিকার থাকাও চাই। দেখা যায়, স্বার্থনীতির পক্ষপাতী অধিকাংশ লোকই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে; যে নীতিতন্ত্র, সমস্ত মানব চিত্তকে—মানবের সমস্ত প্রবৃত্তি ও ধারণাকে, কেবল ইন্দ্রিয়বোধ ও ইন্দ্রিয়বোধের ব্যাপার-সকল হইতে টানিয়া বাহির করে, স্বাধীনতাকে স্বীকার করা সে নীতিতন্ত্রের অধিকারায়ত্ত নহে।

কোন একটা মনোজ্ঞ ইন্দ্রিয়বোধ যখন আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে, এবং মুগ্ধ করিয়া তাহার পর চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন আমাদের চিত্ত একটা কষ্ট, একটা অভাব, একটা প্রয়োজন অনুভব করে: তখন চিত্ত বিচলিত হয়, চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই ব্যাকুলতা প্রথমে অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্টভাবে থাকে, একটু পরেই একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে; যে বিষয়কে পাইয়া আমরা সুখানুভব করিয়াছিলাম, এবং যাহার অভাবে এখন কষ্ট পাইতেছি, আমাদের ব্যাকুলতা সেই বিষয়ের প্রতি তখন ধাবিত হয়। তীব্রতার মাত্রা কিছু কমই হোক্, বেশীই হোক্—চিত্তের এই চাঞ্চল্যই বাসনা।

এই বাসনাতে স্বাধীনতার কি কোন লক্ষণ আছে? স্বাধীনতা কাহাকে বলে? যখন আমি জানি, আমি আমার কার্য্যের কর্ত্তা, আমার ইচ্ছামত কোন কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি, রহিত করিতে পারি, কিংবা সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত থাকিতে পারি, তখনই আপনাকে স্বাধীন বলিয়া অনুভব করি। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে

যখন সেই কার্য্য করিব বলিয়া সঙ্কল্প করি, তখন ইহাও বেশ জানি, আমরা ইহার বিপরীত সঙ্কল্প করিতেও সমর্থ; তখনই আমরা স্বাধীনতা অনুভব করি।

যখন আমার আত্ম-চৈতন্য অব্যর্থরূপে সাক্ষ্য দেয়,—আমিই এই কাজের কর্ত্তা, তখনই সেই কাজ স্বাধীন কাজ এবং তখনই সেই কাজের জন্য আপনাকে দায়ী বলিয়া অনুভব করি। আমাতে অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে, এবং এই সকল ক্রিয়া বহির্দর্শকের চক্ষে আমার স্বেচ্ছাকৃত কাজ বলিয়া ভুল হইতেও পারে; কিন্তু আমার কখনই ভুল হইতে পারে না;— সাক্ষী চৈতন্যের নিকট ভুল হওয়া অসম্ভবঃ যে কোন কাজই হউক না, কোন্ কাজটা স্বেচ্ছাকৃত এবং কোন্ কাজটা স্বেচ্ছাকৃত নহে, অমাদের সাক্ষীচৈতন্য তাহার পার্থক্য বেশ উপলব্ধি করিতে পারে।

যে চেষ্টা স্বেচ্ছাকৃত ও স্বাধীন তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। বাসনা ইহার ঠিক্ বিপরীত। বাসনা যখন চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করে তখনই উহা প্রবৃত্তি নামে অভিহিত হয়; আমাদের ভাষা ও আত্মচৈতন্য উভয়ই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রবৃত্তির অধীনে মানুষ অকর্ত্তা; প্রবৃত্তি যতই প্রবল হয়, উহার বেগ যতই দুর্দ্দমনীয় হয়, ততই আত্মার যে নিজস্ব কার্য্যশক্তি আছে—আত্মশাসনী শক্তি আছে—সেই আদর্শ হইতে মানুষ দূরে পড়িয়া যায়।

যে ইন্দ্রিয়বোধ বাসনার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বাসনাকে একটা নির্দ্দিষ্ট আকার প্রদান করে, বাসনার ন্যায় সেই ইন্দ্রিয়বোধেরও বশে, আমরা পরাধীন। যদি কোন প্রীতি-জনক বস্তু আমার সম্মুখে স্থাপিত হয়, আমার কি সুখবোধ হইবে না? যদি কোন কষ্টকর জিনিস আমার সম্মুখে আসে,—আমার কি কষ্ট হইবে না? ঐ সুখকর অনুভূতি অন্তর্হিত হইলেও, স্মৃতি ও কল্পনার পথে আবার উদয় হইলে, উহা পূর্ব্ববৎ সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিতে পারিতেছি না বলিয়া কি আমার কষ্ট হইবে না? উহার অভাব ও প্রয়োজন কি আমি অনুভব করিব না? যে বস্তুকে পাইলেই আমার ব্যাকুলতার শান্তি হয়, আমার মনের কষ্ট দূর হয়, সেই বস্তুর প্রতি আমার বাসনা কি ধাবিত হইবে না?

বাসনার উদয়ে অন্তরের মধ্যে কিরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়, একবার প্রণিধান করিয়া দেখ:—তুমি দেখিতে পাইবে, তোমার চিন্তার অপেক্ষা না রাখিয়া, তোমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া, সেই বাসনা উঠিতেছে পড়িতেছে, বাড়িতেছে কমিতেছে। তোমার ইচ্ছায়, বাসনার উদয়ও হইতেছে না, নিবৃত্তিও হইতেছে না।

অনেক সময় আমাদের ইচ্ছা বাসনার সহিত যুদ্ধ করে, এবং অনেক সময় যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাহার বশীভূত হয়। যে সকল বহির্বিষয় হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ জন্মে, সেই বহির্বিষয়কে আমরা দোষ দিই না, এবং ঐ ইন্দ্রিয়বোধ হইতে যে বাসনা উৎপন্ন হয় সে বাসনাকেও দোষ দিই না, আমরা শুধু দোষ দিই সেই ইচ্ছাকে,—যার সম্মতিতে বাসনার উদয় হইয়াছে, এবং দোষ দিই সেই সকল কার্য্যকে যাহা বাসনা হইতে প্রসূত হইয়াছে; কেন না ঐ সকল কার্য্য আমাদের নিজ আয়ত্তের মধ্যে।

ইচ্ছা ও বাসনা এক নহে; অনেক সময় বাসনা, ইচ্ছাশক্তির বিলোপ করে, এবং মানুষের দ্বারা এমন সকল কাজ করাইয়া লয় যাহা মানুষ সে সমস্ত আপনার কাজ বলিয়া মনে করিতে পারে না, কারণ সে কাজ

তাহার স্বেচ্ছাকৃত নহে। এমন কি, আদালতে অনেক অপরাধের আসামী এই ওজরের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রচণ্ড বাসনা ও দুরতিক্রমণীয় প্রবৃত্তির বশে তাহারা কাজ করিয়াছে, এই কাজে তাহাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না—এই বলিয়া তাহারা নিজ দোষ ক্ষালন করিবার চেষ্টা করে।

যদি বাসনাই ইচ্ছার মূল ভিত্তি হইত, তাহা হইলে বাসনা যতই প্রবল হইত আমরা ততই স্বাধীন হইতাম। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহার বিপরীতটাই সত্য। যে পরিমাণে বাসনার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে, মানুষের আত্মপ্রভুত্ব কমিয়া যায়, এবং যে পরিমাণে, বাসনা হীনবল হয় ও প্রবৃত্তি-অনল নির্ব্বাপিত হয়, সেই পরিমাণে, মানুষ আবার আপনার উপর প্রভুত্ব লাভ করে।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, বাসনার উপর আমাদের কোন প্রভাব নাই। কোন দুই বস্তু ভিন্ন হইতে পারে, তাই বলিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কাজেকাজেই যে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, এ কথা বলা যায় না। কতকগুলি পদার্থ আমাদের হইতে দূরে রাখিয়া, কিংবা সেই সকল পদার্থ আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে সেই সুখকে আমাদের চিন্তা হইতে দূরে রাখিয়া, আমরা কিয়ৎপরিমাণে, ঐ সকল পদার্থের ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াকে অপসারিত করিতে পারি, এবং ঐ সকল পদার্থ আমাদের মনে যে বাসনার উদ্রেক করে সেই বাসনাকে এড়াইতে পারি। আমরা, কতকগুলি পদার্থ আমাদের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিয়া, আমাদের অন্তরে কতকগুলি ইন্দ্রিয়বোধ ও কতকগুলি বাসনার উদ্রেক করিতে পারি; তাই বলিয়া উহাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত বলা যায় না; আপনার উপর আপনি পাথর নিঃক্ষেপ করিয়া যে আঘাত-বোধ হয় সেই আঘাত-বোধটা যেমন স্বেচ্ছাকৃত নহে, ইহাও তেমনি। এই সকল বাসনার নিকট নতশির হইলে, উহাদের আরও বলবৃদ্ধি হয়, এবং উহাদিগকে প্রতিরোধ করিলে, উহাদের তেজ কমিয়া যায়। উপযুক্ত নিয়ম অবলম্বন করিলে আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও কতকটা আমাদের বশে আনিতে পারা যায়, এমন কি উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াতেও কতকটা রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায়। ইহাতে করিয়া সপ্রমাণ হয় যে, আমাদের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যাহা ইন্দ্রিয় ও বাসনা হইতে ভিন্ন; বাসনাদির উপর ঐ শক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব না থাকিলেও, কখন-কখন ঐ শক্তি উহাদের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব প্রকটিত করিয়া থাকে।

ইচ্ছা ও বুদ্ধি এক না হইলেও ইচ্ছা বুদ্ধিকে পরিচালিত করে। ইচ্ছা করা ও জানা—এই দুইটি ব্যাপার স্বরূপতঃ ভিন্ন। আমরা আমাদের ইচ্ছামত বিচার করি না, পরন্তু বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম-অনুসারে আমরা বিচার করি। সত্যের জ্ঞান ও ইচ্ছার সঙ্কল্প এক নহে। যেমন মনে কর,—ইচ্ছা এ কথা বলে না যে, পিণ্ডের বিস্তৃতি আছে, পিণ্ড আকাশে অবস্থিত, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে ইত্যাদি। তথাপি, আমাদের বুদ্ধির উপর আমাদের ইচ্ছার অনেকটা প্রভুত্ব আছে সন্দেহ নাই। আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, স্বাধীনভাবেই কার্য্য সম্পাদন করি, কতকগুলি বিষয়ের প্রতি, আমরা অল্প কিংবা অধিকক্ষণ, অল্প পরিমাণে কিংবা অধিক পরিমাণে মনোযোগ দিই; সুতরাং ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিকে যেমন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে পারে, তেমনি মন্দীভূত ও নির্ব্বাপিত করি-

তেও পারে। অতএব এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, আমাদের অন্তরে এমন একটি পরাশক্তি বিদ্যমান আছে যাহা কি বুদ্ধি, কি ইন্দ্রিয় চেতনা—আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করে, উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি করে, উহাদের সহিত মিশ্রিত হয়, উহাদিগকে পরিশাসিত করে, উহাদিগকে স্বাভাবিকভাবে পরিপুষ্ট হইতে দেয়; ইচ্ছাশক্তির সহিত বিচ্ছেদ হইলে উহাদের আসল প্রকৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কেন না, যে মনুষ্য ইচ্ছাশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে স্বীকার করে যে, সে তার আপনার প্রভু নহে, সে যেন সে-মানুষই নহে। আসল কথা, সেই মহতী ইচ্ছা-শক্তির মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এই ইচ্ছাশক্তি এমন সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইলেও এই শক্তিকে লোকে অনেক সময় ভুল বোঝে। ইচ্ছা ও বাসনাকে এক করিয়া ফেলিয়া একটা অদ্ভুত খিচুরী করিয়া তোলে। যাঁহারা এইরূপ খিচুরী পাকাইয়াছেন, তাহার মধ্যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশশতাব্দির বিপরীত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক—স্পিনোজা, মাল্‌ব্রাঁশ্‌, কঁদিয়াক্‌ প্রভৃতিকেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় অতিমাত্র ধর্ম্মভাব ও ভ্রান্ত ধর্ম্মভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্য হইতে মনুষ্যের নিজস্ব কর্তৃত্ব শক্তি উঠাইয়া লইয়া সমস্ত কর্তৃত্বশক্তি ঈশ্বরেতেই কেন্দ্রীভূত করে; এবং অপর সম্প্রদায়, সেই শক্তি প্রকৃতির উপর আরোপ করে। এক সম্প্রদায়ের মতে, মানুষ ঈশ্বরেরই একটা প্রকার-ভেদমাত্র; অপর সম্প্রদায়ের মতে, মানুষ প্রকৃতিপ্রসূত একটি ফল মাত্র। বাসনাকে যদি একবার কর্তৃভাবের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্বাধীনতা বলিয়া আর কিছুই থাকে না, স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। একটি দর্শনতন্ত্র তেমন প্রণালীবদ্ধ না হইলেও, কতকগুলি তথ্যের অনুসরণ করিয়া, সহজ জ্ঞানের দ্বারা উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার শক্তি হইতে, অকর্ত্তা বাসনাকে পৃথক্‌ করিয়া, ঐ দর্শনশাস্ত্র, যাহা মানুষের বিশেষ লক্ষণ, সেই প্রকৃত কর্তৃত্বশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইচ্ছাশক্তিই কর্তৃপুরুষের প্রধান ধর্ম্ম ও অব্যর্থ লক্ষণ। যে পুরুষ ইচ্ছা করিতে পারে, নিজ ইচ্ছার দ্বারা কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে, এবং সেই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া আপনাকে অনুভব করে, সেই সকল কার্য্যের দায়িত্ব অনুভব করে, সে কেমন করিয়া অন্য এক পুরুষের প্রকার-ভেদ মাত্র হইবে? ঐ শক্তি সে অন্য এক সত্তা হইতে ধার করিয়াছে এ কথা কেমন করিয়া বলিবে?

একটা কর্তৃত্বহীন মনোব্যাপার হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র যদি প্রকৃত কর্তৃশক্তির ব্যাখ্যা,—স্বেচ্ছাসাপেক্ষ স্বাধীন কর্তৃশক্তির ব্যাখ্যা করিতে না পারে, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, ইহা একপ্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ঐ দর্শনতন্ত্র হইতে প্রকৃত নীতিতত্ত্ব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না; কেন না, নীতি বলিলেই তাহার মূলে স্বাধীনতা আছে এইরূপ বুঝায়। কোন ব্যক্তির উপর আচরণের নিয়ম চাপাইতে হইলে দেখা আবশ্যক, সেই নিয়ম পালন কিংবা লঙ্ঘন করিবার তাহার সামর্থ্য আছে কি না। কোন কার্য্যের ভাল-মন্দ সেই কার্য্যের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু যে উদ্দেশ্যে সেই কার্য্য সম্পাদিত হয় তা-

ছার উপরেই নির্ভর করে। সুবিচারপরায়ণ আদালতের নিকট, অপরাধ উদ্দেশ্যেতেই অপরাধ বর্ত্তে, এবং উদ্দেশ্যেরই সহিত দণ্ড সংযুক্ত। অতএব যেখানে স্বাধীনতা নাই, যেখানে বাসনা ও প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই, সেখানে নীতিতত্ত্বের ছায়াও থাকিতে পারে না। কিন্তু এসব কথা পাড়িয়া, আমরা ইন্দ্রিয় মূলক নীতিকে একেবারে অপসারিত করিতে চাহি না। ঐন্দ্রিয়িক নীতির যেটি মূল সূত্র, সেই মূল সূত্রটি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখাইব যে সে মূলসূত্র হইতে ভাল মন্দের ধারণা কিংবা তৎসংযুক্ত অন্য কোন নৈতিক ধারণা বাহির হইতে পারে না।

আলোক ও বর্ণজ্ঞান।

অক্ষি-যবনিকায় (Retina) বিস্তৃত দৃষ্টি-নাড়ীর (Uptic nerve) প্রান্তে বাহিরের আলোক পড়িলে তাহা কি প্রকারে মস্তিষ্কে চালিত হইয়া দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন করে, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে অদ্যাপি কেহই তাহার সন্ধান দিতে পারেন নাই। বিষয় যতই জটিল ও দুর্ব্বোধ হউক না কেন, আজকালকার দিনে কোন ব্যাপারেরই ব্যাখ্যানের অভাব হয় না। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এজন্য আজকাল এ সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা স্থান পাইয়া গিয়াছে। কেবল পুস্তক পড়িয়া এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে গেলে জ্ঞানলিপ্সুর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রসিদ্ধ শারীরতত্ত্ববিদ্ হালিবার্টন্ সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—আলোক অক্ষি-যবনিকার উপর পড়িয়া যে পরিবর্ত্তন করে, সেটা সম্ভবতঃ নিছক্ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। যবনিকায় যে জীবসামগ্রী (Protoplasm) বিস্তৃত থাকে, তাহার উপর আলোক পড়িলেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, এবং এই পরিবর্ত্তনই দৃষ্টিনাড়ীর প্রান্তকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। কিন্তু ইহার পর উত্তেজনাটা মস্তিষ্কে পরিবাহিত হইয়া যে কি প্রকারে দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন করায়, হালিবার্টন সাহেব তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ব্যাপারটা এতই জটিল যে এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করা সত্যই অসম্ভব।

আলোক পদার্থ-বিশেষের উপর পড়িয়া তাহাকে যে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করে, তাহাতে আর এখন অবিশ্বাস করা চলে না। শত শত প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় আলোকের রাসায়নিক কার্য্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ক্লোরিন (Chlorine) ও হাইড্রোজেন (Hydrogen) বায়ুকে একটি কাচপাত্রে মিশাইয়া অন্ধকার ঘরে রাখিলে, উভয় বায়ু কেবল মিশিয়া থাকে মাত্র। এ অবস্থায় তাহাদের কোনই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। কিন্তু ঐ পাত্রটিকে কিছুক্ষণ সূর্য্যালোকে রাখিয়া দিলে আলোকের স্পর্শে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন্ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ উৎপন্ন হয়। ফটোগ্রাফের কাচের উপরকার প্রলেপ আলোক পাইলেই যে কালো হইয়া যায় তাহাও আলোকের রাসায়নিক কার্য্যের একটি উদাহরণ। বৃক্ষের পত্রাদিতে যে সকল সবুজবর্ণের অণু পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহারাই বাতাসের অঙ্গারক বাষ্পকে* বিশ্লিষ্ট করিয়া অঙ্গার উৎপন্ন করে, এবং তাহাই দেহস্থ করিয়া উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্যের আলোকই উদ্ভিদের হরিদাণুগুলিকে সক্রিয় করায়। সুতরাং অক্ষি-যবনিকায় পড়িলে তদ্দ্বারা জীবসামগ্রীর পক্ষে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হওয়ারই যে সম্ভাবনা

অধিক, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না।

পাঠকের বোধ হয় অবিদিত নাই, অক্ষি-যবনিকার কোষগুলি প্রায় সর্ব্বদাই একপ্রকার রঙিন্ পদার্থে পূর্ণ থাকে, এবং তা'ছাড়া দণ্ডাকৃতি ও মোচাকারের (Rods and Cones) কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ উহার সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে,আলোক পাইলেই কোষমধ্যস্থ বর্ণকণিকাগুলি সচঞ্চল হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মোচাকার জিনিসগুলাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ভেক প্রভৃতি কতকগুলি ইতর প্রাণীর অক্ষি-যবনিকায় যে দণ্ডাকৃতি পদার্থ থাকে, সেগুলিকে প্রায়ই একপ্রকার বর্ণরসে (Visual purple) পূর্ণ দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অন্ধকারে ঐ রসের কোন বিকার হয় না, কিন্তু আলোক পাইলেই তাহা আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। কাজেই আলোক চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিলে যে সত্য সত্যই রাসায়নিক কার্য্য সুরু হয়, তাহাতে আর মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

অক্ষিযবনিকার বিস্তৃত দণ্ড ও মোচাকার কোষগুলির উপরে আলোকের পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণজ্ঞান উৎপত্তির সহিত ইহার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মনে হইয়াছিল, এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হেরিং ও হেলেম্‌হোজ্ সাহেব বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে দুইটি পৃথক সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন।

হেরিং সাহেব বলেন,—ভেকের অক্ষি-যবনিকাস্থ কোষে যেমন একপ্রকার বর্ণরস দেখা যায়, মানবের চক্ষু-যবনিকায় সম্ভবতঃ সেইপ্রকার তিনজাতীয় বর্ণরস বর্ত্তমান আছে, এবং এই রসগুলির প্রত্যেকেই এক বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট। লাল সবুজ, পীতনীল এবং শ্বেতকৃষ্ণ এই তিন জোড়া বর্ণের আলোক ঐ তিনজাতীয় বর্ণরসের এক একটিকে নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য করে। অর্থাৎ লালসবুজ আলোক যে বর্ণরসের উপর কার্য্য করে, নীলপীত বা শ্বেতকৃষ্ণালোক তাহার কোনই পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

লালসবুজ ইত্যাদি যে তিন জোড়া বর্ণের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকের দুই দুইটি বর্ণ পরস্পরের বিরোধী। অর্থাৎ লালসবুজ এই বর্ণযুগ্মের লালে সবুজের কোনই উপাদান নাই, এবং এই দুই বর্ণ পরস্পরের বিরোধী বলিয়া ইহাদের মিশ্রণে অপর কোন বর্ণ উৎপন্ন হয় না। শ্বেতকৃষ্ণ এবং নীলপীতের দুই দুইটি বর্ণের মধ্যেও ঠিক ঐপ্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান। হেরিং সাহেব বলেন,—এই তিন জোড়া আলোকের প্রত্যেক জোড়া সাড়া দিবার উপযোগী বর্ণরসের উপর আসিয়া পড়িলে, অবস্থা বিশেষে সেই পদার্থের ক্ষয় বা বৃদ্ধি আরম্ভ হয়, এবং এই ক্ষয় বৃদ্ধির দ্বারাই একই বর্ণরসের সাহায্যে দুই দুইটি বর্ণের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অক্ষি-যবনিকার সেই তিন জাতীয় বর্ণরসের মধ্যে যেটি কেবল লালসবুজে সাড়া দিতে পারে, তাহার উপর কোন আলোক পড়িয়া যদি পদার্থের পরিমাণকে বাড়াইয়া দেয়, তবে দ্রষ্টা ইহার ফলে কেবল লাল বর্ণই দেখিতে পাইবে; এবং অপর কোনও আলোক দ্বারা যদি সেই পদার্থেরই ক্ষয় আরম্ভ হয়, দর্শকের চক্ষে তবে তাহা সবুজ আলোক হইয়া দাঁড়াইবে।

এখন হেলম্‌হোজ্ বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে কি

বলেন দেখা যাউক। তিন জোড়ার ছয়টি মূলবর্ণের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া, এবং অক্ষি-যবনিকার বর্ণরসের তিনটি পৃথক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া হেরিং সাহেব বর্ণজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হেলম্‌হোজ্ সাহেব প্রথমেই ঐপ্রকার ছয়টি মৌলিক বর্ণের অস্তিত্বে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাঁর মতে, লাল সবুজ ও বেগুণিয়া এই তিনপ্রকার বর্ণ ব্যতীত আর কোন বর্ণই আমাদের চক্ষু দেখিতে পায় না। আমরা যে এগুলি ছাড়া আরো শত শত বর্ণ দেখি, তাহারা ঐ তিন বর্ণেরই বিচিত্র সংমিশ্রণের ফল। হেরিং সাহেবের সিদ্ধান্তের সহিত হেলম্‌হোজের মতবাদের ইহাই একমাত্র অনৈক্য নয়। হেলম্‌হোজ্ সাহেব আরো বলিয়াছেন, দৃষ্টিনাড়ীগুচ্ছের প্রান্তে যে সকল দণ্ড ও মোচাকার কোষ দেখা যায়, তাহারাই আলোকে উত্তেজিত হইয়া চক্ষুতে বর্ণ দেখায়। বাহিরে এই দণ্ড ও মোচাকার কোষগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখা যায় না বটে, কিন্তু মূলে তাহারা তিন জাতীয় বিধর্ম্মী জিনিস। লাল সবুজ বেগুণিয়া এই তিনটি মৌলিক বর্ণের আলোক ঐ তিনজাতীয় কোষের উপর একসঙ্গে কাজ করিতে পারে না, এক একটি আলোক ঐ তিন শ্রেণীর কোষের এক একটিকে বাছিয়া লইয়া উত্তেজিত করে, এবং সেই উত্তেজনা দৃষ্টিনাড়ী দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই জন্য লোহিতালোক উৎপাদক কোষগুলি যে আলোক দ্বারা উত্তেজিত হয়, তাহাকে আমরা লোহিতালোক রূপেই দেখি। অপর দুই জাতীয় কোষ এই আলোকে মোটেই সাড়া দিবে না।

আমাদের চক্ষু কেবল লাল সবুজ ও বেগুণিয়া এই তিন মৌলিক বর্ণ দেখিয়াই ক্ষান্ত হয় না। শত শত আলোক চক্ষে পড়িয়া সর্ব্বদাই শত শত বিচিত্র বর্ণের উৎপত্তি করে এই প্রসঙ্গের হেলম্‌হোজ্ সাহেব বলেন, কোনও মিশ্র আলোক অক্ষি-যবনিকায় পড়িয়া যদি পূর্ব্বোক্ত তিন জাতীয় কোষকে একসঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজিত করে, তবে ইহার ফল লাল সবুজ ও বেগুণিয়া এই তিনটি মৌলিক বর্ণের মিশ্রণের ফলের অনুরূপ হয়। কাজেই মূলে তিনটি মাত্র বর্ণ থাকিলেও আমরা এইপ্রকারে নানা বর্ণের আলোক দেখিতে আরম্ভ করি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে হেলম্‌হোজের মতে, সেই দণ্ডাকৃতি ও মোচাকার তিন জাতীয় কোষের বিচিত্র উত্তেজনাই বর্ণ বৈচিত্র্যের মূলকারণ। যদি কোন আলোক কেবল এক জাতীয় কোষকেই উত্তেজিত করে, তবে এই কোষের জাতি-হিসাবে আমরা লোহিত সবুজ বা বেগুণিয়া বর্ণের মধ্যে কেবল মাত্র একটিকেই দেখিতে আরম্ভ করিব।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি পৃথক সিদ্ধান্তের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল হেলম্‌হোজের উক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। সহস্র সহস্র বর্ণের মধ্যে ইনি কেবল লাল সবুজ ও বেগুণিয়াকে কি কারণে মৌলিক বর্ণ বলিয়া স্থির করিলেন, তাহার বিশেষ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপযোগী নয়। চক্ষুর উপর সুকৌশলে নানা বর্ণের আলোকপাত করিয়া হেলম্‌হোজ্ সাহেব অক্ষি-যবনিকাকে কেবল লাল সবুজ ও বেগুনিয়া বর্ণেই অবসাদগ্রস্ত হইতে দেখাইয়াছিলেন। এই প্রকার আরো অনেক পরীক্ষার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ই যে মৌলিক বর্ণ তাহা নিঃসন্দেহে স্থির হইয়াছিল। হেরিং সাহেবের ন্যায় নিছক্ কল্পনার উপর দাঁড়াইয়া হেলম্‌হোজ্ সাহেব কোন কথাই বলেন নাই, যাহা বলিয়াছেন হাতে হাতে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। বোধ হয় এই-জন্যই আজ হেলম্‌হোজের সিদ্ধান্তটির এত আদর। *

* আলোকের শক্তি কি প্রকারে দৃষ্টিনাড়ীর উত্তেজনায় পরিণত হয়, আমরা পরপ্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

সেখ সাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধুকে দেখিলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবে; তাঁহার অন্তরের ভিতরে যাহাই থাক্, তাহা অনুসন্ধান করিবার তোমার আবশ্যক নাই।

পাপীরা ঈশ্বরের নিকট কৃতপাপের জন্য অনুতাপ করে; কিন্তু যাহারা ঈশ্বরকে জানে, তাহারা ইহাই বলে, হে ভগবন! বড়ই পরিতাপ যে ইহজীবনে তোমার সেবা করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সাধু ঈশ্বরের নিকট ইহাই নিবেদন করে, হে ঈশ্বর! আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া আমার উপর বিচার করিও না, কিন্তু দয়াময় তুমি; তোমার দয়ার দিক দিয়া আমার উপর বিচার কর।

প্রতিদিন প্রভাতে বিনয়ের সহিত ইহাই যেন বলিতে পারি, হে ভগবন্! তোমাকে ত ভুলিব না, কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া তোমার এই দীন ভৃত্যকে স্মরণে রাখিও।

যাহারা ঈশ্বরের পথের যাত্রী, তাহারা শত্রুর অন্তরেও বাধা দিতে চায় না। যাহারা অপরের সহিত বিবাদ করিতে যায়, তাহারা সে পথের সন্ধান কোথায় পাইবে।

ছিন্ন পরিচ্ছদ সাধুতার পরিচায়ক নহে। যিনি সংসারের চিন্তা আড়ম্বর ও মোহ ছাড়িতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু।

অনেক সময়ে একাকী থাকাই নিরাপদ। দুর্বৃত্ত সহচর হইতে প্রায়ই বিপদ ঘটে।

যে অহঙ্কারী, সে আপনাকেই বড় দেখে। কিন্তু যদি কখন সত্যের আলোক প্রতিফলিত হয়, সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে, যে তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দীন আর কেহ নাই।

অপরে শতমুখে একজনের প্রশংসা করিতেছিল, তাহাতে তিনি বিনয়ের সহিত বলিলেন, আপনারা আমার বাহিরের কার্য্যগুলি দেখিয়া প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু আমার অন্তরের মলিন ভাবের ত পরিচয় পান নাই। লোকে ময়ূরের পক্ষচ্ছটা দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু হায়! যখন সে নিজে তাহার কদর্য্য পায়ের উপর দৃষ্টিপাত করে, লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

আমার অবস্থা বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। একবার চমকাইতেছে, পরক্ষণেই গাঢ় অন্ধকার! আমি এক একবার এখান হইতে স্বর্গের ছবি দেখিতে পাই, তাহার পরেই হায়! নিজের পদনিক্ষেপও যে লক্ষ্য করিতে পারি না। যদি ঈশ্বরে স্থায়ীভাবে মনস্থির করিতে পারিতাম, তবে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া যাইতাম।

কোরাণে আছে, আমাদের গ্রীবার যে ধমনী আছে, ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও আমাদের নিকটে। তিনি আমাদের এত নিকটে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা তাঁহার প্রতি বিমুখ।

একজন সাধু ব্যাঘ্রের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন, তথাপি তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ দেখিয়া আর একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, দেহে এত যন্ত্রণা তবুও ঈশ্বরের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতার কারণ কি? সাধু উত্তরে বলিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পাপ আমাকে দংশন করিতে পারে নাই, আমি কেবল দৈববিপদে পড়িয়াছি। ঈশ্বর যদি মৃত্যুকে প্রেরণ করেন, আমি বিন্দুমাত্র বিষন্ন হইব না। আমি কেবল ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিব, প্রভু! তোমার সেবায় এই দীন ভৃত্যের কি অপরাধ, যে তাহার প্রতি তুমি বিরক্ত হইয়াছ।

রাজা একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি আমার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। সাধু উত্তরে বলিলেন, যখন ঈশ্বরকে ভুলি, তখনই আপনার কথা মনে হয়।

সাধু! বৃথা তুমি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেছ। কার্য্যে সাধুতার পরিচয় দাও; বৃথা বেশ ধারণে কি হইবে।

যিনি আপনাকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তিনি ঈশ্বরকে জানিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

দস্যুর নিকটে সদুপদেশ নিতান্তই নিষ্ফল। লৌহশলাকা কঠিন প্রস্তরে কিছুতেই বিদ্ধ হয় না।

সম্পদের সময় দীনদরিদ্রকে বিস্মৃত হইও না। সহাস্য-বদনে দান কর। তাহা না হইলে সম্পদ অচিরেই চলিয়া যাইবে।

একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি কাহার নিকট হইতে ভব্যতা শিক্ষা করিয়াছ। উত্তরে বলিল অসভ্যের নিকট হইতে। যাহা ভব্যতার বিরোধী—তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া ও তৎসমস্ত পরিহার করিয়া আমার এই ভব্যতা শিক্ষা।

অতি-ভোজন করিও না, অতি-ভোজনে জ্ঞান ও বুদ্ধি সমস্তই তেজোহীন হইয়া পড়ে।

অনুতাপে ঈশ্বরের ক্রোধ চলিয়া যায়; কিন্তু নিন্দুকের নিন্দা হইতে লোকের নিস্তার কোথায়?

গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে প্রতিবেশীরা আমার কার্য্যাকার্য্য কিছুই জানিতে পারে না। কিন্তু কই, ভগবন্! তোমার দৃষ্টি হইতে যে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারি না!

সাধুভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর, যে নিন্দুকের মুখ রুদ্ধ হইবে। সেতার যতক্ষণ বেসুর না হয়, ততক্ষণ তাহার কান টিপিবার আবশ্যক কোথায়?

তোমার সম্পত্তি প্রভুত্ব মান মর্য্যাদা সকলই থাক্, তোমার মন যদি ঈশ্বরে সংস্থিত থাকে, তবে ত তুমি ঋষি।

পশু পক্ষী সকলেই উচ্চরবে আনন্দে ঈশ্বরের যশ ঘোষণা করিতেছে, তুমিই কি কেবল নীরব থাকিবে?

পাখীরা যে কেবল ঈশ্বরের যশ গান করিতেছে, তাহা নহে; গোলাপের প্রত্যেক কণ্টকেরও জিহ্বা আছে। তাহারাও ঈশ্বরের নাম-কীর্ত্তনে নীরব নহে।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

এস দয়া, গলে যাক্ পাষাণ হৃদয়।
দীন পুণ্য, হোক্ প্রাণ পবিত্রতাময়।

এস মৈত্রী, খুলে দাও মনের দুয়ার,
নরনারী সকলেরে করি আপনার।
এস ভক্তি, ঊর্দ্ধপানে টেনে লও মন,
এস প্রীতি, ছিন্ন হোক্ স্বার্থের বন্ধন,
এস শুভবুদ্ধি, তব উদার আলোকে
চলি সংসারের পথে সুখে দুঃখে শোকে।
বিরাজ অচলা শান্তি হৃদয়ের মাঝে,
ছয় রিপু তোমা হেরি দূরে থাক্ লাজে,
সর্ব্বোপরি তুমি দেব আসি দেখা দাও,
নববর্ষে নবশক্তি জীবনে জাগাও।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

নানা কথা।

উপাসনা। বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহর্ষিদেবের বাটীতে পারিবারিক বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত করিয়াছিলেন। উপাসনাদির কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।—পুণার ডেকান কলেজের অধ্যাপক E. A. Woodhouse উডহাউস সাহেব Vedic magazine and Gurukul Samachar নামক পত্রে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের পুনরধ্যাপনার আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতীয় ছাত্রগণকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। ভারতীয় ধর্ম্মের সহিত দর্শনশাস্ত্রের ঘনিষ্টতম যোগ। এই শিক্ষায় ভারতীয় যুবকগণের চরিত্র সংগঠিত হইবে। তিনি বলেন, ভারতীয়গণ সকল অবস্থাতেই উচ্চতম আদর্শ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য লালায়িত। তাহারা ঐ আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতেও কিছুমাত্র কাতর নহে। তিনি বলেন যদি ভারতীয় প্রাচীন মহত্ব জাগাইতে চাও, প্রাচীন ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে জাগাইয়া তোল, জাতীয় ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান কর। তিনি আরও বলেন দর্শনের কূট সিদ্ধান্তের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া যাহাতে চরিত্রের মহত্ব বিকশিত হয়, মনের কোমল ও উৎকৃষ্ট ভাবের বিকাশ সাধন হয়, অধ্যাপককে এই ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

Indian Review January 08. p. 54.

আদি ব্রাহ্মসমাজ।—বিগত দুই তিন বৎসর ধরিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য রাঁচিতে গমন করায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় দুই মাস ধরিয়া বুধবারের উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছে।

জপ।—"জপস্তদর্থ চিন্তনং" কেবলমাত্র শব্দবিশেষের পুনরাবৃত্তিতে জপ হয় না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহার অর্থ চিন্তা করা চাই। অর্থের দিকে মন সন্নিবেশ না করিয়া কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া চলিয়া গেলাম; মনকে স্তোক দিলাম যে উপাসনা করিয়াছি। কিন্তু সে উপাসনায় কি হইবে, যদি উপাসনায় প্রতি বাক্য ও প্রতি শব্দের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিলাম। আমরা বৈদিক সংস্কৃত মন্ত্রে উপাসনা করি। একই মন্ত্র, একই বাঙ্গালা তাৎপর্য্য। অনেক সময় হয় ত সমস্বরের দিকে আমাদের লক্ষ্য রহিয়াছে, বচনবিন্যাসের প্রতি সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভাব গ্রহণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই বা প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার দিকে আমাদের আয়াস নাই। উপাসনা করিতে আসিয়া আমাদের সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে, যাহাতে উপাসনার প্রতি শব্দ ও প্রতি বাক্য উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাৎপর্য্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য যায়, বাক্য ও শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের প্রতি আমাদের সমস্ত মন প্রধাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক উপাসনায় যোগ দিবার সার্থকতা ঠিক এইখানে। উপাসনান্তে বিদায় গ্রহণের সময় বক্তৃতাটি বেশ হইয়াছে, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের পরিবর্ত্তে, যেন সমস্ত হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি, যে ব্যাকুল চিত্তে ঈশ্বরোপাসনা করিতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে সে ব্যাকুলতার অবসান হইয়াছে, উপাসনা ও উপদেশ শ্রবণে হৃদয় জুড়াইয়াছে, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিয়া ধন্য ও আপ্তকাম হইয়াছি।

উপাসনা-মন্ত্র।—প্রাচীনদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিবার জন্য, সমগ্র হিন্দুজাতির সহিত সখ্যবন্ধনের জন্য এবং সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিক জলন্ত সত্যের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য আমরা প্রাচীন ঋষিগণের সাধনলব্ধ ব্রহ্মমন্ত্র সকল গ্রহণ করিয়াছি এবং ঐ ঋষিমন্ত্রেই ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আসিতেছি। ঋষিরা আমাদের অবলম্বিত ঐ এক এক মন্ত্রের সাধনায় ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ঐ ব্রহ্মমন্ত্রের শাণিত খড়্গাঘাতে অজ্ঞানের দৃঢ়বন্ধন ছেদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাচীন ঋষিদিগের শাণিত অস্ত্র এক্ষণে আমাদের হস্তে;কিন্তু চালনা করিবার আবশ্যকীয় শক্তি নাই বা তাহা লাভ করিবার জন্য আমাদের সেরূপ আয়াস নাই; তাই আমরা সিদ্ধকাম হইতে পারিতেছি না। মনঃসংযম ও সাধনা প্রভাবে যে দিন মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিব, দূর হইতে দেখিতে পাইব, মুক্তির দ্বার অনাবৃত হইয়া আসিতেছে এবং বুঝিতে পারিব হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

উপদেশ। যাহাতে উপাসনা-মন্ত্রের প্রতিবাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিবার আমাদের সামর্থ্য জন্মে, ঠিক এই ভাবে উপদেশ দেওয়া আচার্য্যের কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত কয়েক বুধবার ধরিয়া ব্রহ্মোপসনার প্রতিশ্লোকের প্রতি শব্দ প্রথম হইতে ব্যাখ্যা করিয়া চলিতেছেন। শঙ্করের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহারও আভাস দিতেছেন। রবিবাবু ইতিপূর্ব্বে মাঘোৎসবে যে সকল মর্ম্মস্পর্শী লিখিত বক্তৃতা পাঠ

করিয়াছেন, ব্রাহ্মসাহিত্য জগতে তাহার স্থান অতি-উচ্চে। আজকালকার তাঁহার বাচনিক বক্তৃতার তাঁহার প্রতিভা তুল্যভাবে বিকশিত, তাঁহার আবেগ-ময়ী ভাষায় শ্রোতৃবৃন্দ বাস্তবিকই বিমুগ্ধ। রবিবাবুর বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্ম-সাধারণের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে স্বদেশীয়তা। আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চান, হিন্দু-জাতির গৌরব রক্ষা করিতে চান, আর্য্য পিতৃ-পিতামহকে সমুচিত শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে চান। আদিব্রাহ্মসমাজ বিদেশীয় সত্যের প্রতি বিমুখ নহেন, এবং ইহাও বলিতে চান, যে একই সত্য যদি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়, তবে স্বদেশীয় গ্রন্থ-নিবদ্ধ সত্য আমাদের অধিকতর আদরের এবং অন্তরঙ্গ বলিয়াই উহা বিশেষরূপে গ্রাহ্য। অধিকন্তু যে ভাবে ঐ সত্য দেশীয় শাস্ত্রে বিকশিত তাহা আমাদের প্রকৃতির বিশেষ উপযোগী। আজ কাল স্বদেশীভাবের স্রোত চারি-দিকে প্রবাহিত। ফলতঃ এই স্বদেশীয় ভাবে আধ্যা-ত্মিক ধর্ম্মের বিকাশ স্থান—এই আদি ব্রাহ্মসমাজ। এবং স্বদেশীয় ভাবসম্পন্ন বলিয়াই আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বিদেশী চাকচিক্যে সকলেরই মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, কিন্তু মনীষী রামমোহনরায় বা দেবেন্দ্রনাথ উহাতে বিচলিত হন নাই। তাঁহারা কতপূর্ব্বে স্বদেশীয় ভাবে স্বদেশীয় অথচ বিশ্বজনীন সত্যগুলিকে নির্ব্বাচিত ও বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১১।৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৮৬২৸৵০
সমষ্টি	...	৩১৭৪।/৬
ব্যয়	...	৪৫৮।৵৩
স্থিত	...	২৭১৫৸৶৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
১১৫৸৶৩
২৭১৫৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২১৪৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নয়নাথ মুখোপাধ্যায়
১০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র
৺ হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দান
৪৲
২১৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৬।৶৬
পুস্তকালয়	...	১১৵০
যন্ত্রালয়	...	৬২।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৭।৵০
সমষ্টি	...	৩১১।৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৮৭॥৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩০।৶৩
পুস্তকালয়	...	১৵৩
যন্ত্রালয়	...	১৩৯৶৯
সমষ্টি	...	৪৫৮।৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগদান করিবেন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ-কল্প

দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৯।

৭৮০ সংখ্যা | ১৮৩০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"
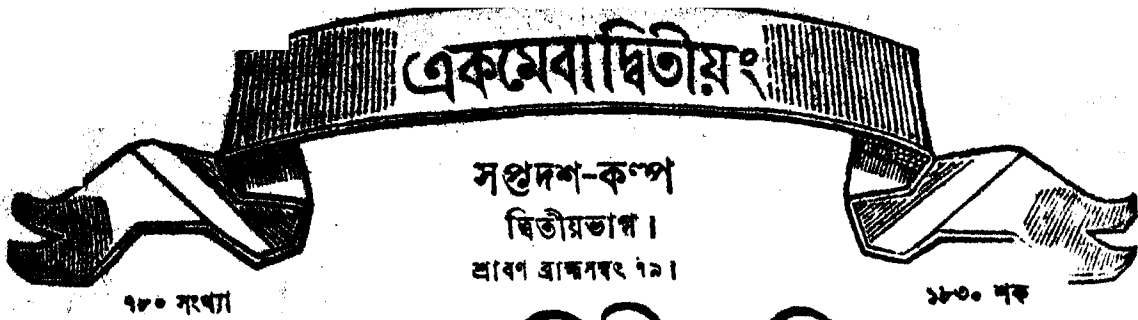
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

৭। যে কাজে তোমার বাক্যস্খলন হয়, লজ্জা চলিয়া যায়, যে কাজে কাহার প্রতি তোমার দ্বেষ, সন্দেহ, অভিসম্পাত প্রকাশ পায়, কিংবা এমন কোন কাজে তোমার প্রবৃত্তি হয়, যাহা দিনের আলোক সহিতে পারে না, যাহা জগতের মুখের দিকে তাকাইতে সাহস পায় না, জানিবে, সে কাজ তোমার স্বার্থের অনুকূল নহে। যে ব্যক্তি আপনার মনকে, এবং আপনার অন্তর্দেবতার পূজাকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহার কোন শোকের অভিনয় করিতে হয় না, কোন দুর্দ্দশায় পড়িয়া পরিতাপ করিতে হয় না, তাহার বিজনতাও আবশ্যক হয় না, লোকসঙ্গও আবশ্যক হয় না; সে জীবনকে প্রার্থনাও করে না, জীবন হইতে পলায়নও করে না; তাহার শরীর, তাহার আত্মাকে দীর্ঘকাল কি অল্পকাল আবৃত করিয়া রাখিবে,—সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। যদি তাহার এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হয়,—জীবনের অন্য সমস্ত নিয়মিত কাজের জন্য সে যেমন প্রস্তুত, ইহার জন্যও সে তেমনি প্রস্তুত। যতদিনই সে বাঁচিয়া থাকুক,—যাহাতে তাহার মন, জ্ঞানবুদ্ধি-বিশিষ্ট সামাজিক জীবের যোগ্য কাজে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে পারে,—তাহার সমস্ত দীর্ঘ জীবনে, তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

৮। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংযত হইয়াছে, বিশোধিত হইয়াছে, তাহাকে যদি পরীক্ষা কর ত দেখিতে পাইবে, তাহার মধ্যে বিকৃতভাব, মলিনভাব, কিংবা মিথ্যাভাব কিছুই নাই। মৃত্যু তাহার অসম্পূর্ণ জীবনের সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া তাহাকে বিস্ময়বিহ্বল করিতে পারে না; কেহ এ কথা বলিতে পারে না যে, জীবনের নাট্যমঞ্চে তাহার অভিনয় শেষ না হইতে হইতেই সে প্রস্থান করিল। তা'ছাড়া, তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা দাসত্ব-ব্যঞ্জক, কিংবা যাহা আড়ম্বরসূচক; সে অন্যের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আসক্তও

না, কিংবা তাহাদের হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াও থাকে না; তাহাদের নিকট তাহার দায়িত্বও নাই, তাহাদিগকে সে একেবারে বর্জ্জনও করে না।

৯। বিবেকবুদ্ধিকেই নিয়ত মানিয়া চলিবে; কেননা, যদি তুমি কোন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এমন কোন কাজে প্রবৃত্ত হও, যাহা বিশ্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধ, যাহা বুদ্ধি-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবের প্রকৃতির বিরুদ্ধ, তাহা হইলে, সেই বিবেকবুদ্ধিই তোমাকে সেই কাজ হইতে বিরত করিবে। এই জ্ঞান-বুদ্ধি-সমন্বিত মানব-প্রকৃতির অনুশাসন এই যে, অবিবেচনার সহিত কোন কাজ করিবে না, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেবতাদের আদেশ পালন করিবে।

১০। আর যত চিন্তা আলোচনা, সমস্তই তোমার মস্তিষ্ক হইতে দূর করিয়া দেও; কেবল উপরিউক্ত দুই চারিটি উপদেশ মনে রাখিও; আর মনে রাখিও, প্রতি মনুষ্যের জীবন বর্ত্তমানেই অবস্থিত,—যে বর্ত্তমানকাল কালের একটি বিন্দুমাত্র; কেননা, যাহা অতীত, তাহা অতিবাহিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ কাল অনিশ্চিত। জীবনের গতি সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে বদ্ধ; এবং মানুষ যেখানে অবস্থিতি করে, তাহাও জগতের একটি ক্ষুদ্র কোণ মাত্র। যে যশ খুব দীর্ঘস্থায়ী, তাহাই বা কতদিনের জন্য? হায়! যে সব ক্ষণস্থায়ী দীন মর্ত্ত্য মানব পৃথিবীতে একটু যশ রাখিয়া যায়, তাহারা আপনাদের সম্বন্ধে অল্পই জানে; এবং তাহাদের সম্বন্ধেও আরও কম জানে, যাহারা তাহাদের বহুপূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

১১। উপরে যে সকল বিষয়ের ইঙ্গিত করিলাম, তাহার সহিত এই কথাটিও যোগ করিতে পার:—তোমার মনে যে কোন বিষয় উপস্থিত হইবে, তাহার লক্ষণ ও কার্য্যাদি-সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় লইবে; তাহা হইলে তাহার আসল প্রকৃতি কি, সে বস্তুটা স্বরূপতঃ কি, তৎসম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে ও সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিতে পারিবে। কেননা, এই জীবনে যাহা কিছু ঘটে, তাহা যদি পদ্ধতিক্রমে পরীক্ষা ও আলোচনা কর, তাহাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি জানিতে পার, প্রত্যেক বস্তুর প্রয়োজন কি, কি প্রকারে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার ব্যবহার করে—সমগ্র বিশ্বের সম্বন্ধে, ও যে মানুষ সেই বিশ্বরূপ রাজধানীর এক-জন নাগরিক, সেই মানুষের সম্বন্ধে তাহার মূল্য কি, সেই বস্তু আমার মনের উপর কিরূপ ছাপ্ দেয়, উহা কত দিন স্থায়ী হয়, উহাকে ব্যবহার করিতে গেলে আমার মধ্যে কি গুণ থাকা আবশ্যক—সুশীলতা, ধৈর্য্য, সত্যপরায়ণতা, সরলতা, ও আত্মনির্ভরশীলতা থাকা আবশ্যক কি না—এই সমস্ত যদি আলোচনা কর, তাহা হইলে তোমার মন যেরূপ মহত্ত্বলাভ করিবে, এমন আর কিছুতে করিবে না।

১২। তুমি যদি বিবেকের শাসন মানিয়া চল, যদি শ্রম, বীর্য্য ও ধীরতার সহিত তোমার হাতের কাজগুলি সম্পাদন কর, তুমি যদি কোন নূতন আকর্ষণের প্রতি ধাবিত না হও, যদি তোমার অন্তর্দেবতাকে বিশুদ্ধ রাখ—এমনিভাবে বিশুদ্ধ রাখো যে এখনি বিধাতার দান বিধাতাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় ফিরাইয়া দিতে পার, যেন তোমার জীবনের শেষ পরীক্ষা—এই ভাবে যদি তোমার মনকে দৃঢ় ও সুসংযত কর, তুমি যদি এই সকল উপদেশবাক্যকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাক, তোমার যেটি শ্রেষ্ঠ অংশ, তাহারই অনুগত

হইয়া চল,—কিছুরই ভয় না করিয়া, কিছু-রই আকাঙ্ক্ষা না করিয়া তোমার প্রকৃতির অনুসারে চল, নির্ভীকভাবে তোমার কথার সত্যতা রক্ষা কর, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক, তাহা হইলেই তুমি সুখী হইবে—এ কাজে সমস্ত জগৎও তোমাকে বাধা দিতে পারিবেনা।

১৩। যেমন অস্ত্রচিকিৎসকেরা আক-স্মিক ঘটনার জন্য তাহাদের অস্ত্রাদি সর্ব্ব-দাই সঙ্গে রাখে, সেইরূপ তুমি সেই সব তত্ত্বজ্ঞানের মূলসূত্র ও নিয়ম ঠিক্ করিয়া রাখিবে, যাহার দ্বারা তুমি মানব-বিষয়ের ও ঐশ্বরিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হও; এবং ইহাও মনে রাখিও যে তোমার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজে, মানব-বিষয়ের সহিত ঐশ্বরিক বিষয়ের বিশেষ যোগ আছে; কারণ, ঐশ্বরিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, মনুষ্যের প্রতি তোমার ব্যবহার যথোচিত হইবে না।

১৪। উদ্দেশ্যহীন হইয়া আর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে না। বার্দ্ধক্যে তোমার কাজে লাগিবে বলিয়া তুমি যে তোমার জীবনের দৈনিক ঘটনা-সকল লিখিয়া রাখিয়াছিলে, তাহাও পড়িবার সময় পাইবে না। তোমার গন্তব্য পথের দিকে দ্রুতপদে চল। আর আত্মবঞ্চনা করিও না। যদি তোমার নিজের উপর কিছুমাত্র মমতা থাকে, যত দূর পার, এখনও তোমার নিজের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও।

১৫। মানুষের তিনটি জিনিস আছে;—শরীর, হৃদয়, ও মন। শরীরের ইন্দ্রিয়-বোধ, হৃদয়ের আবেগ, মনের জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যপদার্থের ছাপ্ পড়ে—এই বিষয়ে মানুষ, গো-মহিষাদি পশুর সমান; প্রবৃত্তির আবেগ ও আবেশে অধীর হইয়া পড়া—ইহা হিংস্রজন্তু, ফ্যালারিস্, ও নীরোর ন্যায় ভোগবিলাসী-দের ধর্ম্ম—নাস্তিক ও বিশ্বাসঘাতকদের ধর্ম্ম, এবং যাহারা লোকলোচনের অগোচরে কাজ করে, তাহাদের ধর্ম্ম। এগুলি যদি মনুষ্য ও পশুর সাধারণ ধর্ম্ম হইল, তবে এখন দেখা যাক্, সাধুব্যক্তির বিশেষ লক্ষণ কি? সাধুব্যক্তির বিশেষত্বটি এই যে, তাঁহার বিবেকবুদ্ধিই তাঁহার জীবনের নেতা; তাঁহার ভাগ্যে যাহা কিছু আইসে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট; বহির্ব্বিষয়ের কোলাহলে অবিচলিত থাকিয়া, তিনি তাঁ-হার অন্তর্দেবতাকে পরিশুদ্ধ রাখেন, শান্ত রাখেন, এবং তাঁহার আদেশবাণী দেববাণীর ন্যায় পালন করেন। বাক্যে তিনি সত্য-পরায়ণ, কার্য্যে তিনি ন্যায়-পরায়ণ হয়েন। যদি সমস্ত জগৎ তাঁহার সততায় অবিশ্বাস করে, তাঁহার আচরণের প্রতিবাদ করে, তিনি যে সুখী, সে বিষয়ে সন্দেহ করে,—তথাপি তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হয়েন না, কিংবা তাঁহার জীবনের গন্তব্য পথ হইতে তিলমাত্র পরিভ্রষ্ট হয়েন না। তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া, শান্ত-দান্ত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়া, নিজ অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, সেই গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হয়েন।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি।

ঐন্দ্রিয়িক দর্শনের মতে,—উপযোগী কিংবা আবশ্যক ছাড়া মঙ্গল আর কিছুই নহে। মূলসূত্রের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া, মনোজ্ঞের স্থানে শুধু উপযোগীকে বসাইয়া, ঐন্দ্রিয়িক দর্শন অনেকগুলি আপত্তি

খণ্ডন করিবার সুবিধা পাইয়াছে; কেননা, ঐ সম্প্রদায় এই কথা সর্ব্বদাই বলে, সুবিবেচিত স্বার্থ, আর আপাত-প্রতীয়মান ইতর স্বার্থের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে; কিন্তু আমরা দেখাইব,—এই মতবাদ, অপেক্ষাকৃত একটু মার্জ্জিত আকার ধারণ করিলেও ভালমন্দের পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই।

যদি উপযোগিতা, কিংবা সুবিধাই ভাল কাজের একমাত্র মানদণ্ড হয়, তাহা হইলে কোন কাজ করিবার সময় সেই কাজে আমার কি লাভ হইতে পারে, শুধু এই বিষয়টির প্রতিই আমার দৃষ্টি রাখিতে হয়।

মনে কর, আমার একজন বন্ধু, যাহাকে আমি নিরপরাধী বলিয়া জানি, সে হঠাৎ রাজার, কিংবা লোকের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইল—(লোক মতের উৎপীড়ন এক এক সময় রাজার উৎপীড়ন অপেক্ষাও বেশী); এই অবস্থায় আমার বন্ধুর বন্ধুত্ব রক্ষা করা আমার পক্ষে হয়ত বিপদ-জনক, কিংবা বন্ধুকে পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে লাভজনক। এক দিকে নিশ্চিত বিপদ, আর একদিকে অব্যর্থ লাভ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই স্থলে, হয় আমার দুর্ভাগ্য বন্ধুটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নয় স্বার্থের নীতিকে—সুবিবেচিত স্বার্থের নীতিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

কিন্তু উহারা উত্তরে এই কথা বলিতে পারে, মানুষ-ব্যাপারের অনিশ্চিততা ভাবিয়া দেখ; ভাবিয়া দেখ, তুমিও একদিন এই-রূপ বিপদে পড়িতে পার; যদি তোমার বন্ধুকে তুমি এখন পরিত্যাগ কর, তাহাহইলে তোমার বিপৎকালেও তোমার বন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন।

আমি এই উত্তর দিই:—প্রথমতঃ ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত, বর্ত্তমানই সুনিশ্চিত। যদি কোন কার্য্যে আমার এখনি নিশ্চিত লাভ হয়, তবে ভাবী বিপদের শুধু সম্ভাবনা মনে করিয়া, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ লাভকে বিসর্জ্জন করা নিতান্তই অসঙ্গত। তা'ছাড়া আমার বিবেচনায়, ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাগুলিই আমার অনুকূলে।

লোকমতের কথা আমার নিকট বলিও না। যদি ব্যক্তিগত স্বার্থই একমাত্র যুক্তি-সঙ্গত নীতি সূত্র হয়, তবে লোকমতও আমার অনুকূলে হওয়া উচিত। যদি লোকমত আমার বিরুদ্ধ হয়, তাহাহইলে উক্ত নীতিসূত্রের সত্যতার সম্বন্ধে উহাই ত একটা আপত্তির কথা; কারণ, যে নীতিসূত্রটি সত্য, যাহা ন্যায্যরূপে মানব-কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা কেমন করিয়া লোকসাধারণের বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ হইবে?

অনুতাপের আপত্তিও উত্থাপন করিও না। যদি স্বার্থ-নীতি সত্য হয়, তবে সেই সত্যের অনুসরণ করিয়া আমার কি কখন অনুতাপ হইতে পারে? বরং তাহাতে আমি আত্মপ্রসাদই অনুভব করিব।

এখন বাকী রহিল পারত্রিক দণ্ড-পুরস্কারের কথা। কিন্তু যে দর্শনতন্ত্রে মানবজ্ঞান শুধু রূপান্তরিত ইন্দ্রিয়বোধের সীমার মধ্যেই বদ্ধ, সে দর্শনতন্ত্রে পরলোকের বিশ্বাস কিরূপে স্থান পাইবে?

অতএব দেখা যাইতেছে, আমার বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার পক্ষে আমার কোন প্রয়োজনই নাই—কোন কার্য্যপ্রবর্ত্তক হেতুই নাই। অথচ, সমস্ত মানব-মণ্ডলই এই বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে চাপাইতেছে; আমি যদি ঐ বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে না পারি, আমি লোকের নিকট অবমানিত হইব।

যদি সুখই আমাদের চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শুধু কাজে ভাল-মন্দ বর্ত্তায়

না, উহার ভালমন্দ পরিণামে; উহার সুখজনক, কিংবা দুঃখজনক পরিণামের উপর ভালমন্দ নির্ভর করে।

কোন একব্যক্তি বধ্যভূমিতে নীত হই-তেছে দেখিয়া ফঁটেনেল্ বলিয়াছিলেনঃ—"ঐ লোকটার গণনায় ভুল হইয়া গিয়াছে"। এই যুক্তি অনুসরণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়—ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ করিয়াও যদি কোন প্রকারে মৃত্যুদণ্ডকে এড়াইতে পারিত, তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত, উহার গণনা ঠিক হইয়াছিল; এবং তাহা হইলে তাহার আচরণও প্রশংসনীয় হইত। তবেই দাঁড়াইতেছে, ঘটনা অনু-সারেই কোন কাজ ভাল, কিংবা মন্দ; আসলে কোন কাজ ভাল, কিংবা মন্দ নহে।

সততা যদি উপযোগিতা ভিন্ন আর কিছুই না হয়, তাহা হইলে ফলাফল গণনার প্রতিভাই বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা; শুধু বিজ্ঞতা কেন—উহাই ধর্ম্ম! কিন্তু এই প্রতিভা সকলের আয়ত্তের মধ্যে নহে। প্রতিভার অর্থ—দীর্ঘকালের জীবনের অভিজ্ঞতা চাই, পর্য্যবেক্ষণের এমন একটা ধ্রুব শক্তি চাই, যাহাতে করিয়া কার্য্যের সমস্ত ফলাফল এক নজরেই উপলব্ধি হইতে পারে, এমন সতেজ ও বিশাল মস্তিষ্ক থাকা চাই, যাহাতে করিয়া সমস্ত সম্ভাবনা-গুলি গণনার মধ্যে আনিয়া, তাহা ঠিকমত ওজন করা যাইতে পারে। দীনচেতা কোন অজ্ঞ যুবক ভাল-মন্দের পার্থক্য, সৎ-অস-তের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে না। মানব-ব্যাপারসমূহ এরূপ তমসাচ্ছন্ন যে, খুব দূরদৃষ্টি থাকিলেও, অনপেক্ষিত অভুতপূর্ব্ব ঘটনার হাত হইতে এড়ান দুষ্কর। বস্তুতঃ, "সুবিবেচিত" স্বার্থের নীতিতন্ত্রের মধ্যে, সততার শিক্ষার জন্য, একটা বিরাট্ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আবশ্যক; সচরাচর সৎ-কার্য্যের জন্য এরূপ বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ সৎকার্য্যের বীজ মন্ত্রঃ—"উচিত কাজ ত করি, তার পর যা হ'বার তা' হবে"। কিন্তু এই বীজমন্ত্রটি, স্বার্থ-নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। দুয়ের মধ্যে একটা নির্ব্বাচন করিতে হইবে;—একমাত্র স্বার্থই যদি যুক্তির অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে নিঃস্বার্থপরতা একটা মিথ্যা কথা, একটা প্রলাপবাক্য, মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

তথাপি সমস্ত মানবমণ্ডলী নিঃস্বার্থপর-তার কথা বলিয়া থাকে, এবং নিঃস্বার্থপর-তার তাহারা অর্থ এরূপ বুঝে না যে, স্থায়ী সুখের জন্য, ধ্রুব সুখের জন্য, কোন সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে হইবে। এ কেহ বিশ্বাস করে না যে, কোন উৎকৃষ্ট বিশেষ প্রকারের সুখের আকাঙ্ক্ষাই নিঃস্বার্থপরতা। যে কোন প্রকার স্বার্থই হউক, স্বার্থ-বিব-র্জ্জিত কোন মহৎ উদ্দেশ্যের নিকট স্বার্থকে বলিদান করাকেই নিঃস্বার্থপরতা বলে; সমস্ত মানবমণ্ডলী এইরূপ ভাবকেই নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া শুধু বুঝে, তাহা নহে, এইরূপ নিঃস্বার্থপরতা মানবসমাজে বাস্ত-বিকই আছে বলিয়া বিশ্বাস করে; আরও বিশ্বাস করে যে, এইরূপ নিঃস্বার্থভাবের কাজ করিতে মানব-আত্মা সমর্থ। মহাত্মা Regulus আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর শক্রদের দেশে গিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভীষণ মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে,—আপনার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া, বেশ মানমর্য্যাদার সহিত সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে কোন স্বার্থের ভাব দেখা যায় না; তাই লোকে, তাঁর এই আত্মোৎসর্গের জন্য তাঁহাকে এত ভক্তি করে।

কিন্তু কেহ কেহ বলিবেন, তা' কেন— প্রচণ্ড যশো-লালসাই রেগুলাস্‌কে ঐরূপ কাজে উত্তেজিত করিয়াছিল; অতএব ঐ পুরাতন রোমকের কাজে যাহা বীরত্ব বলিয়া আপাতত প্রতীয়মান হয়, তাহা আসলে এক-প্রকার স্বার্থপরতা। মানিয়া লও, ঐরূপ ভাবের স্বার্থবুদ্ধি, যার-পর নাই অসঙ্গত ও হাস্যজনক—মানিয়া লও, বীরেরা নিতান্তই স্বার্থপর এবং তাহাদের এই স্বার্থপরতা অবিবেচনামূলক, ও ফলাফলজ্ঞানশূন্য। Regulus-এর, Assas কিংবা Saint Vincent De Paul-এর প্রস্তর-প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া উহাদিগকে তবে বাতুলাশ্রমে পাঠানোই শ্রেয়। সেখানকার কড়াক্কর নিয়মের মধ্যে থাকিলে, উহাদের উদারতা, বদান্যতা, মহানুভবতা প্রভৃতি সমস্ত রোগ সারিয়া যাইবে, উহাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে—উহারা আবার প্রকৃতিস্থ হইবে;—উহারা আবার সেই সব লোকের মত হইবে, যাহারা শুধু আপনার কথাই ভাবে, যাহারা স্বার্থ ছাড়া আর কোন নীতি বুঝে না।

যদি নিজের কোন স্বাধীনতা না থাকে, ভাল-মন্দের মধ্যে যদি স্বরূপত কোনো পার্থক্য না থাকে, স্বার্থই যদি আমাদের জীবনের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, তাহা হইলে আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই থাকে না।

প্রথমতঃ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কর্ত্তব্যতা বলিলেই বুঝায়—এমন কোন জীব আছে যে কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ; স্বাধীন জীব ছাড়া কর্ত্তব্য-শব্দ আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। তাহার পর, কর্ত্তব্যতার প্রকৃতিই এইরূপ, যদি আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে ত্রুটি হয়,—আমরা আপনাকে অপরাধী বলিয়া অনুভব করি; পক্ষান্তরে, যদি আমাদের স্বার্থ ঠিক্ না বুঝি—যদি ভুল করিয়া বুঝি,—তাহার ফল শুধু এই হয়—আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই। তবে কি, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়া, ও অপরাধী হওয়া একই জিনিস? এই দুইটি ধারণা মূলতঃ বিভিন্ন। তুমি আমাকে পরামর্শচ্ছলে বলিতে পার "তোমার স্বার্থ যদি তুমি ঠিক্ না বোঝো, তাহা হইলে তুমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে; কিন্তু তুমি এরূপ উপদেশ দিতে পার না— "তোমার স্বার্থ ঠিক্ না বুঝিলে তুমি অপরাধী হইবে।"

অপরিণামদর্শিতাকে কেহ কখন অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করে না। নৈতিক হিসাবে যখন উহার কেহ দোষ দেয়, তখন হদ্দ এই কথা বলে, উহাতে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়।

অতএব, প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয় করা অনেক সময় অতীব দুরূহ; কিন্তু যাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা সকল সময়েই প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট। প্রবৃত্তি ও বাসনা উহার সহিত যতই যুদ্ধ করুক না কেন, মিথ্যা-যুক্তি যতই কুতর্ক আনুক না কেন, বিবেকবুদ্ধির স্বাভাবিক সংস্কার, অন্তরাত্মার গূঢ় বাণী, স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রজ্ঞার উপদেশ—ঐ সমস্ত কুতর্কজালকে বিদূরিত করিয়া, কর্ত্তব্যতাকে প্রকাশ করে।

স্বার্থের উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন,—উহার প্রতিবাদ করা যাইতে পারে—উহার সহিত একটা বোঝাপড়া করা যাইতে পারে।—অসংখ্য প্রকারে সুখী হওয়া যাইতে পারে। তুমি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছ, এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে আমি ধনশালী হইব। তাহা সত্য; কিন্তু আমি ধন-ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শান্তি ভালবাসি। শুধু সুখের হিসাবে দেখিতে গেলে, আলস্য অপেক্ষা কর্ম্মচেষ্টা

যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা যায় না। কাহাকেও স্বার্থসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যেমন কঠিন, এমন আর কিছুই না;—পক্ষান্তরে সততা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ।

যাই বল না কেন, অবশেষে, উপযোগিতা, কার্য্যতঃ মনোজ্ঞতাতেই পরিণত হইতেছে, অর্থাৎ সুখেচ্ছাতেই পরিণত হইতেছে। এখন, সুখের কথা যদি ধর,—উহা মনের ক্ষণিক ভাবের উপর, লোকবিশেষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি ভাল-মন্দের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ না থাকে, তবে উচ্চতর সুখ ও নিম্নতর সুখ বলিয়া সুখের মধ্যেও কোন তারতম্য থাকিতে পারে না; এমন কোন সুখের সামগ্রী নাই, যাহা আমাদিগকে অল্প-বিস্তর সুখী না করে। আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতিই এইরূপ। এইজন্যই স্বার্থবুদ্ধি এরূপ খামখেয়ালী। যেটা যা'র ভাল লাগে, তাই তা'র স্বার্থ; কেন না, যেটা যা'র ভাল লাগে, তা'র বিবেচনায় সেইটিই তা'র স্বার্থ বলিয়া মনে হয়। একজন ইন্দ্রিয়-সুখে বেশী মুগ্ধ হয়, আর একজন মনের সুখে,—হৃদয়ের সুখে বেশী মুগ্ধ হয়। ইন্দ্রিয় সুখের স্থানে যশঃ-স্পৃহা আসিয়া কাহারও চিত্ত অধিকার করে; কাহারও নিকট প্রভুত্বস্পৃহা, যশঃ-স্পৃহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটা বিশেষ প্রকৃতির অধীন; অতএব প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণে আপনার স্বার্থ বুঝিয়া থাকে; তা' ছাড়া, আমার আজিকার যে স্বার্থ, তাহা কালিকার স্বার্থ না হইতেও পারে।

স্বাস্থ্যের তারতম্যে, বয়সের প্রভাবে, ঘটনার পরিবর্ত্তনে, আমাদের রুচি ও মেজাজেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। আমরা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের বাসনা ও স্বার্থও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

কিন্তু কর্ত্তব্যের অবশ্যতা সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। অবশ্যকর্ত্তব্য বলিলে, এমন একটা কিছু বুঝায়, যাহার নড়্‌চড়্‌ হইতে পারে না। কর্ত্তব্যের বন্ধন কোন ব্যপদেশেই শিথিল হয় না, এবং সকলের পক্ষেই সমান বলবৎ। ইহা এমন একটা জিনিস, যাহার নিকটে, আমার মনের খেয়াল, আমার কল্পনা, আমার সূক্ষ্ম চেতিতা, সমস্তই অন্তর্হিত হইবার কথা; ইহা একপ্রকার মঙ্গলভাব, যাহার সহিত বাধ্যতার ভাব জড়িত। আমার মেজাজ যে প্রকারই হোক্ না কেন, আমার অবস্থা যাহাই হোক্ না কেন, যে কোন বাধাই থাক্ না কেন, কর্ত্তব্যের আদেশ আমি পালন করিতে বাধ্য। ইহার নিকট শৈথিল্য চলে না, আপোসে বোঝাপড়া চলে না, ওজর-আপত্তি খাটে না। তোমার প্রতিই হউক্, আমার প্রতিই হউক্, যে কোন স্থানে হউক্, যে কোন অবস্থায় হউক্, আমাদের মনের ভাব যে-রকমই হউক্,—কর্ত্তব্যের আদেশ হইবামাত্রই তাহা পালন করিতে হইবে। কর্ত্তব্যের আদেশ আমরা না মানিতেও পারি, কেন না আমরা স্বাধীন; কিন্তু এই আদেশ লঙ্ঘন করিবা মাত্রই আমাদের মনে হইবে, আমরা দোষ করিতেছি, আমরা আমাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছি, এবং তাহার দণ্ডস্বরূপ তখনই আমাদের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইবে।

স্বার্থের উপদেশ, বিষয়বুদ্ধির উপদেশ শুনিলে আমরা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, না শুনিলে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইতে পারি। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি সুখী হইতে বাধ্য? যে জিনিস দুর্লভ, তাহা আমি

ইচ্ছা করিলেই পাই না, সেই সুখসৌভাগ্যের সহিত কি বাধ্যতা সংযুক্ত হইতে পারে? যদি আমি কোন বিষয়ে বাধ্য হই, তবে যে বিষয়ে আমি বাধ্য, তাহা করিবার শক্তিও আমার থাকা চাই; কিন্তু সুখসৌভাগ্যের উপর স্বাধীনতার বড় একটা হাত নাই; কেননা, সুখসৌভাগ্য এমন অসংখ্য জিনিসের উপর নির্ভর করে, যাহা আমার আয়ত্তের বাহিরে; কিন্তু ধর্ম্মোপার্জ্জন সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ধর্ম্মোপার্জ্জনে আমাদের স্বাধীনতা আছে। নীতিতত্ত্বের হিসাবে—সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টও নহে, নিকৃষ্টও নহে। যদি আমার স্বার্থ আমি ঠিক বুঝিতে না পারি, তাহার দণ্ডস্বরূপ আমি দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিব; কিন্তু অনুতাপ অনুভব করিব না। যে দুঃখ-দুর্দ্দশা শুধু বৈষয়িক, যাহা কোন মানসিক পাপের ফল নহে, তাহা আমাকে অভিভূত করিতে পারে; কিন্তু তাহা আমার হীনতা ঘটাইতে পারে না।

আমরা পুরাতন ষ্টোয়িক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছি না। আমরা দুঃখের প্রতি এই কথা বলি না:—"দুঃখ! তুমি অমঙ্গল নও"। আমরা বরং বলি, যত দূর পার, দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে চেষ্টা কর, আপনার স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, দুঃখ বর্জ্জন কর, সুখ অন্বেষণ কর। আমরা দূরদৃষ্টি ও পরিণামদর্শিতার খুবই পক্ষপাতী। আমরা শুধু এইটি প্রতিপন্ন করিতে চাই যে,—সুখ এক জিনিস, ধর্ম্ম আর এক জিনিস; সুখের স্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক হইলেও কর্ত্তব্যের বাধ্যতা শুধু ধর্ম্মেরই সহিত জড়িত; সুতরাং আমাদের স্বার্থের পাশাপাশি একটা ধর্ম্মনীতির নিয়ম রহিয়াছে। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দেয়, সমস্ত মানব-মণ্ডলী ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই ধর্ম্মনীতির অনুশাসন অকাট্য, উহা লঙ্ঘন করিলে আমার অধর্ম্ম হয়, আমার লজ্জা বোধ হয়। (ক্রমশঃ)

ধনিয়া-সুত্ত।

(মহীতীরবাসী গোপাল ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন)

ধনিয়া।

"পক্কান্ন, গাভীদুগ্ধ আছি খেয়ে পিয়ে,
মহীতীরে ভাই-বন্ধু মিলি করি বাস;
কুটীর ছায়িত, অগিনি আহিত,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"অক্রোধ বন্ধনশূন্য আমি যে এখন,
মহীতীরে সবেমাত্র এক রাত্রি বাস;
গৃহ অনাবৃত, অগ্নি নির্ব্বাপিত,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"অন্ধক-মশক হ'তে মুক্ত ধেনুগুলি
তৃণাচ্ছন্ন গোচরণে চরিয়া বেড়ায়;
আসুক না বৃষ্টি, না করিবে দৃষ্টি,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"নৌকাখানি সুগঠন, বদ্ধ আটে ঘাটে,
বড় বড় ঢেউ ঠেলি তাহে হৈনু পার;
নৌকায় এখন কিবা প্রয়োজন,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"গোপী মম সুচরিতা, পতিব্রতা সতী,
একত্রে করিনু ঘর দীর্ঘকাল ধরি,
নাহি তা'র নামে নিন্দা শুনি কাণে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"চিত্ত মম সংযত, স্বাধীন, বহুকাল,
বহু তপস্যায় তা'র আনিনু স্ববশে;
তাহে পাপ-লেশ না করে প্রবেশ,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"আপন অর্জ্জিতধনে চালাই সংসার,
পুত্রগণ নীরোগ সবল ; নিন্দা কোন
তাহাদের নামে শুনি নাই কাণে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"কারো নহি বৃত্তিভোগী, আপনার প্রভু,
অবাধে আপন মনে ভ্রমি সর্ব্বলোকে ;
দাসত্বে কি কাজ বল মোর আজ,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"আছে গাভী দুগ্ধবতী, আছে বৎস কত,
গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও আছে হেথা,
আছে ও তেমতি বৃষভ গোপতি,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"নাহি গাভী দুগ্ধবতী, না আছে বাছুর,
গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও নাহি মোর,
নাহিও তেমতি বৃষভ গোপতি,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

ধনিয়া।

"সুদৃঢ়-নিখাত খোঁটা * কিছুতে না টলে,
নব এই মুঞ্জদাম, এমনি কঠিন
বাছুরে ছিনিতে নারে কোন রীতে,
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বুদ্ধদেব।

"বৃষভ বন্ধন কাটি পলায় যেমতি,
যেমতি বিহরে নাগ বিদলি লতিকা,
প্রমুক্ত উদাস, কাটি গর্ভবাস ;
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

* * * *

উচ্চনীচ সর্ব্বস্থল করিয়া প্লাবন
মহামেঘ বরষিল উঠিয়া তখন ;
দেখিয়া ধনিয়া, বিগলিত হিয়া,
বুদ্ধদেবে এই ভাবে করে নিবেদন :—

ধনিয়া।

"সামান্য এ লাভ নহে, ওহে ভগবন্,
পাইনু যে ইথে মোরা তব দরশন ;
রাখ হে সুগতে, শরণ-আগতে,
ও পদ-আশ্রয় আজি দেহ মহামুনি।
"আমি ও গৃহিণী মম ধরি ও চরণ
ব্রহ্মচর্য্য আচরিব করিলাম পণ ;
জনম মরণ কাটায়ে বন্ধন
তরি যাব, হবে সব দুঃখ বিমোচন।"

পাপবুদ্ধি মার।*

"পুত্রবান্ পুত্রলাভে হয় পুলকিত,
গোপাল গোধনলাভে তেমনি হর্ষিত ;
আসক্তি হইতে হয় নরের নন্দন,
'অনাসক্ত' নিরানন্দে কাটায় জীবন।"

বুদ্ধদেব।

"পুত্রবান্ পুত্রশোকে সদাই কাতর,
গোপাল গোধনতরে ব্যথিত অন্তর ;
আসক্তিই মানবের দুঃখের কারণ,
অনাসক্ত জনে দুঃখ না হয় কখন।"

চক্ষু ও আলোক।

আলোক বাহির হইতে আসিয়া অক্ষি-যবনিকার উপর পড়িলে, তাহার অংশবিশেষকে নানাপ্রকারে উত্তেজিত করে, এবং ইহার ফলে বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এ সম্বন্ধে দুইটি প্রচলিত সিদ্ধান্তের কথা আমরা গত আষাঢ় মাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" আলোক ও বর্ণজ্ঞান শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আলোকের শক্তি কি প্রকারে দৃষ্টিনাড়ীকে (Optic nerve) উত্তেজিত করে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

---

* খুঁটি।

* ধনিয়া সুত্তের শেষ দুই চরণ এই—

মারো পাপিমাঃ।

"নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি ;
উপধীহি নরস্স নন্দনা,
নহি সো নন্দতি যো নিরুপধী।"

ভগবাঃ।

সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি ;
উপধীহি নরস্স সোচনা,
নহি সো সোচতি যো নিরুপধীতি।"

উপধী—আসক্তি
নিরুপধী—অনাসক্ত

অক্ষিযবনিকার (Retina) গঠন পরীক্ষা করিলে, ইহাতে কতকগুলি কোষ পর পর সজ্জিত দৃষ্ট হয়। আমরা পূর্ব্বে যে দণ্ড ও মোচাকার (Rods and Cones) কোষের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ স্তরমালার সর্ব্বোপরি সেগুলি বিন্যস্ত থাকে। কাজেই ইহাদেরই উপরে সর্ব্বাগ্রে আলোকপাত হয়, এবং আলোকের কাজও ইহাদেরই উপর দিয়া সুরু হয়।

বাহিরের শক্তি প্রাণিকোষের উপর কার্য্য করিয়া কি ফল উৎপন্ন করে, আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং আলোক প্রাপ্ত হইলে দেহের অপর কোষগুলি যে-প্রকারে কার্য্য করে, অক্ষিকোষগুলিও যে সেই প্রকারে কার্য্য করিবে এরূপ সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক্ এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

দেহের নানা অংশের কার্য্য পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, কোষস্থিত জীবসামগ্রী (Protoplasm) উত্তেজনা পাইলে আপনা-হইতেই এক এক প্রকার রস নির্গত করিতে থাকে। এই রসগুলি ইংরাজিতে (Ferments) নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এ গুলিকে কিণ্ব বলা যাইতে পারে। এই রসনির্গমন জীবসামগ্রীর (Protoplasm) সজীবতার একটা প্রধান লক্ষণ। কিণ্বসকল জীবদেহে সঞ্চিত হইলে, কখনই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া থাকে না। ইহাদের প্রত্যেকেই দেহের ভিতরে এক একটা রাসয়নিক কার্য্য সুরু করিয়া দেয়, এবং ইহার ফলে অবস্থা-বিশেষে দেহের ক্ষয় বা গঠনকার্য্য চলিতে আরম্ভ করে। আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ জীবসামগ্রী হইতে সঞ্চিত নানা প্রকার কিণ্বের এই ক্ষয় ও সংগঠন কার্য্য (Katabolic and anabolic) অবলম্বন করিয়াই দেহতত্ত্বের অনেক সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন।

উদাহরণ লওয়া যাউক। পাকাশয়স্থ কোষের (Gastric cells) কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। এগুলি হইতে পেপ্সিন্ (Pepsin) নামক একপ্রকার রস উত্তেজনা পাইলেই নির্গত হয়। উদরস্থ খাদ্যের প্রটিড্ (.Proteid) নামক অংশের সহিত মিশিয়া ইহা রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়, এবং ইহার ফলে প্রটিড্ পিপ্‌টোনে (Peptone) পরিণত হইয়া পড়ে। প্রটিড্ জিনিসটা উদ্ভিজ্জ খাদ্যমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে থাকে। রক্ত এবং পেশার ইহা একটি প্রধান উপাদান। পাকাশয়ের নিকটে ক্লোম (Pancreas) নামক একটি অংশ্ আছে। ইহারও কোষগুলি হইতে একপ্রকার রসনির্গমন দেখা গিয়াছে। ইহা উদরস্থ দ্রব্যের শ্বেতসারের সহিত মিশিয়া, তাহাকে চিনিতে পরিণত করে, এবং এই সকল কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ও স্নায়বিক শক্তিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, প্রাণিদেহের অপর অংশের কোষগুলি যেমন নানা জাতীয় কিণ্ব নির্গত করিয়া জীবনের কার্য্য করিতে থাকে, সম্ভবতঃ অক্ষিযবনিকার কোষগুলির উপরে আলোক পড়িলে, সেই প্রকার কোন কিণ্ব আপনা হইতেই নির্গত হয়; এবং ইহাই অবস্থা-বিশেষে ক্ষয় বা সংগঠন কার্য্য সুরু করিয়া দৃষ্টিনাড়ীকে উত্তেজিত করে।

অক্ষিযবনিকার কোষগুলির উপর আলোক পড়িলে যে সত্যই ঐপ্রকার কার্য্য হয়,সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ওয়ালার (Waller) সাহেব তাহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণ করিয়াছেন। ইনি ভেকের চক্ষু কাটিয়া লইয়া

একটি তারের দুই প্রান্ত চক্ষুর সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তড়িৎমাপকযন্ত্র (Galvanometer) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, অতি মৃদু তড়িৎ-প্রবাহ চক্ষুর পুরোভাগ হইতে পশ্চাৎদিকে চলিতেছে। ইহাই চক্ষুর স্বাভাবিক প্রবাহ। তা'র পর হঠাৎ চক্ষুর উপর আলোকপাত করায় সেই প্রবাহকেই প্রবলতর হইতে দেখা গিয়াছিল। ইহা হইতে পরীক্ষক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন আলোকের উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলে চক্ষে সংগঠন কার্য্য আরম্ভ হয়। পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার আঘাত-উত্তেজনার প্রয়োগে চক্ষুকে অবসন্ন করিয়া আলোকপাত করিলে প্রবাহ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে আসিতে আরম্ভ করে। ডাক্তার ওয়ালার ইহাকে আলোকের ক্ষয়কার্য্যের (Katabolic Changes) অব্যর্থ লক্ষণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

ডাক্তার অলচিন্ (Allchin) একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ। আলোকের শক্তি অক্ষিযবনিকার উপর পড়িলে, যে রস নির্গত হয়, তাহাকে ইনিও দৃষ্টিনাড়ীর উত্তেজনার মূল কারণ বলিয়াছেন। ইহাঁর মতে কেবল এই রসই ক্ষয় বা সংগঠন কার্য্য করিয়া রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন করে, এবং শেষে সেই শক্তিই রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া চক্ষুর পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণ ও স্নায়ুমণ্ডলীর নড়চড় প্রভৃতি নানা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়।

পাকাশয়ের পাকরস ও ক্লোমরসের (Amylopsin) পরিচয় আমরা জানি। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল রস প্রাণীদেহ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আলোক পাইলেই অক্ষিযবনিকার কোষসকল যে রস নির্গত করে, তাহা আজও সংগ্রহ করা হয় নাই। হেরিং সাহেব বর্ণজ্ঞান উৎপত্তির ব্যাখ্যান দিবার সময়, অক্ষিকোষের মধ্যস্থ রস বিশেষে (visual purple) কতকগুলি ধর্ম্মের আরোপ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে যে কিণ্বের (ferment) উল্লেখ করিয়াছি, সম্ভবত তাহা এবং হেরিং সাহেব কল্পিত অক্ষিকোষের রস, মূলে একই জিনিস।

আলোক ও দৃষ্টিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলিকে লইয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এখন আলোক জিনিসটা কি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী ঈথর নামক পদার্থের ক্ষুদ্র তরঙ্গমালাই আলোকের উৎপাদক। এই তরঙ্গগুলির মধ্যে কোনটিই নিজে আলোক নয়। ইহারা যখন চক্ষে আসিয়া অক্ষিযবনিকার কোষগুলির উপর ধাক্কা দেয়, তখন কেবল আমাদেরই নিকট সেই ধাক্কা আলোক-আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। লঙ্কা মরিচ নিজে কটু নয়, জিহ্বাগ্রকে স্পর্শ করিয়া সে কটুতার পরিচয় দেয়। ঈথর তরঙ্গও সেইপ্রকার নিজে আলোক নয়। অক্ষিযবনিকায় আসিয়া ধাক্কা দিয়া, কেবল আমাদেরই চক্ষুতে আলোকের প্রকাশ করে।

জল আলোড়িত হইলে, তাহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের তরঙ্গমালা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ঈথরের কোন অংশ নাড়া পাইলে, তাহাতে ঐ প্রকারের নানা আকারের ছোটবড় তরঙ্গ চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমাদের চক্ষু এই বিচিত্র তরঙ্গমালার সকলগুলিতে

সাড়া দেয় না। বৃহৎ এবং অতিক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি চক্ষুকে মোটেই সচেতন করিতে পারে না। কোন পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে বৃহৎ তরঙ্গগুলি তাপের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। তখন ইহারা দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হইয়া কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া পড়ে। অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির কার্য্য আরো সৃষ্টিছাড়া। দর্শনেন্দ্রিয় বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর ইহাদের কোনই প্রভাব নাই। কতকগুলি পদার্থের উপর আসিয়া পড়িলে, সেখানে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করিয়া নিজেদের আস্তিত্বের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। ফোটগ্রাফের কাচ সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত রাখিলে, ঐ অতিক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই কাচের প্রলেপকে কালো করিয়া দেয়।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক অন্ধকার-ঘরের দীপশিখায় যেন একখণ্ড তারকে গরম করা হইতেছে। উত্তাপ পাইলেই পদার্থমাত্রেরই অণু ঘন ঘন কম্পিত হইতে আরম্ভ করে। এই কম্পন অবশ্য আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না; কিন্তু তাপ পাইলেই যে পদার্থের অণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়, তাহার শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাপের বৃদ্ধির সহিত যখন তারের অণুগুলির অতিদ্রুত কম্পন সুরু হয়, তখন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঈথর চঞ্চল অণুর ধাক্কায় কম্পিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের তরঙ্গ রচনা করিতে থাকে। স্থির জলের কোন অংশকে আলোড়িত করিলে, আলোড়নস্থানকে কেন্দ্র করিয়া যেমন ছোট বড় নানা তরঙ্গ জলাশয়ের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এখানেও তারটিকে কেন্দ্র করিয়া নানা ঈথরতরঙ্গ চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করে। তাপের পরিমাণ যখন অল্প থাকে, তারের আণবিক কম্পন খুব দ্রুত চলে না। কাজেই এই সকল কম্পনের ধাক্কায় যে ঈথরতরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাহার আকার খুব বড় হইয়া পড়ে। এই বৃহৎ তরঙ্গগুলিই তাপতরঙ্গ। চক্ষু ইহাদের আঘাতে সাড়া দেয় না। কোন পদার্থ এই তরঙ্গগুলির ধাক্কা পাইলে গরম হইয়া উঠে মাত্র। তারগাছটিকে সদ্য সদ্য দীপশিখা হইতে উঠাইয়া গাত্রসংলগ্ন করিতে গেলে আমরা যে তাপ অনুভব করি, তাহা ঐ বড় বড় ঈথর-তরঙ্গগুলিরই ধাক্কার সংস্পর্শের ফল।

এখন মনে করা যাউক, তারগাছটিকে যেন বহুক্ষণ দীপশিখায় রাখিয়া অত্যন্ত গরম করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় ইহার অণুগুলির আর পূর্ব্বের ন্যায় ধীর কম্পন থাকিবে না। অতি দ্রুতবেগে ঘন ঘন কম্পিত হইয়া সেগুলি পার্শ্বস্থ ঈথরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা উৎপন্ন করিতে থাকিবে। এই ক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলিই আলোকোৎপাদক তরঙ্গ। ইহারাই চক্ষে আসিয়া ধাক্কা দিলে আলোকের উৎপত্তি হয়।

ইহার পরও তারগাছটিকে গরম করিতে থাকিলে তাহাতে যে সকল অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সে গুলিতে মোটেই আলোক উৎপাদন শক্তি দেখা যায় না, এবং অতি বৃহৎ তরঙ্গগুলির ন্যায় তাহাদের তাপোৎপাদন শক্তি থাকে না। এই সকল তরঙ্গের সংস্পর্শে আসিলে কতকগুলি জিনিসে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়, কেবল তাহা দ্বারাই ইহাদের অস্তিত্ব জানা যায়।

দুইটি প্রবন্ধে চক্ষুর উপরে ঈথর তরঙ্গের যে সকল অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যের কথা আলোচিত হইল, তাহা মনে করিলে চক্ষুকে একটি সুগঠিত যন্ত্র বলিয়া স্বীকার

করিতেই হয়। যান্ত্রশিল্পের উন্নতির সহিত আজ কাল অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের কোনটি-কেই চক্ষুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। বিধাতার নির্দ্দেশে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী যে যন্ত্রকে ধীরে ধীরে সর্ব্বাংশে কার্য্যোপ-যোগী করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা যে চির-দিনই শত শত মানব-"বিশ্বকর্ম্মার" শিল্পচাতুর্য্যকে পরাভব করিতে থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য। একজন খ্যাতনামা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাঁহার একখানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—আমাদের চক্ষু যে খুব সুব্যবস্থিত যন্ত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও সুব্যবস্থিত যন্ত্র আজ কাল অনেক শিল্পী নিজের হাতে প্রস্তুত করিতেছেন। কথা কয়েকটি যে কত অসার এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী বৈজ্ঞা-নিকপ্রবরের মুখে সেগুলি যে কত অশো-ভনীয় হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন। পণ্ডিতপ্রবর নিশ্চয়ই জানেন, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বিশ্বের সৌন্দর্য্য কোন ক্রমে বিশ্বের নিজস্ব নয়। তরুলতার নয়ন-স্নিগ্ধকর শ্যামলতা, ঊষার অরুণিমা এবং মেঘের বিচিত্র বর্ণলীলা, তরুলতা, ঊষা বা মেঘ কাহারও বিশেষ ধর্ম্ম নয়। ঈথর বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ প্রতিফলন করিয়াই তাহার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলে। তার পর এক চক্ষুই সেই তরঙ্গগুলিকে আশ্চর্য্যজনক বিচিত্রবর্ণে পরিণত করে। এই সকল ব্যাপার জানিয়াও যাঁহারা চক্ষুর ন্যায় এক সুব্যবস্থিত অদ্ভুত যন্ত্রকে সাধা-রণ যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া তাহার অপকৃষ্টতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ধৃষ্টতা সত্যই অমার্জ্জনীয়।

ঈথরের অন্ধ কম্পন যে যন্ত্রের সুব্যব-স্থায় বিচিত্রবর্ণের আলোকে পরিণত হইয়া সর্ব্বদা মানবমাত্রেরই আনন্দবর্দ্ধন করি-তেছে, তাহাকে বিশ্বনাথের একটি শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ বলিয়া সকলকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে।

সেখ সাদি।

মানসিক অশান্তি অপেক্ষা ইহজীবনে মনুষ্যের দুর্গতি আর কি হইতে পারে? অমূল্য সম্পদ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা সন্তোষ।

নিত্য আনুগত্য অপেক্ষা মধ্যে মধ্যে বন্ধু-সন্দর্শন প্রণয়ের ভাবকে বিবর্দ্ধিত করে। নিত্য সমুদিত রবি-কিরণ লোকের তত প্রীতিকর নহে, কিন্তু শীতের দারুণ কুজ্ঝটিকায় সূর্য্য-প্রকাশ লোকে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে।

কলহপ্রিয়া স্ত্রী শান্তিময় সংসারে নরকের অশান্তি আনয়ন করে। হে ঈশ্বর! আমাকে অশান্তি, নরক ও যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।

যাঁহারা বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক হইয়াও সংসারলিপ্সু, তাঁহারা কি অপরকে পথ দেখাইতে পারেন? তাঁহা-দের জীবনে ও উপদেশে বৈষম্য থাকিলেও, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে কদাপি বিমুখ হইও না।

সাধু! পাপীর প্রতি বিমুখ হইও না, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার কর।

দস্যুহস্তে নিগ্রহ ভোগ করিয়া জনৈক সাধু বিলাপ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া অপর একজন সন্ন্যাসী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "বিষন্ন হইও না, তোমার সন্ন্যাসের শতগ্রন্থি ছিন্নপরিচ্ছদের ভিতরে নিরাশা ও ক্ষোভের কোন স্থান নাই; নিরবচ্ছিন্ন সহিষ্ণুতা চাই; তাহা না হইলে ঐ বেশ পরিত্যাগ কর। সুগভীর নদীতে লোষ্ট্র নিক্ষেপে তাহার জল কলুষিত হয় না; তুমি এক্ষণে আর অগভীর ক্ষুদ্র নদী নহ, যে সামান্য কারণে বিক্ষিপ্ত হইবে। স্মরণে রাখিও, দয়া ও সহিষ্ণুতার গুণে তোমার সকল পাপ স্খলিত হইবে"।

ভাই! আমাদিগকে পরিণামে ত সকলকেই ধূলা হইতে হইবে; চেষ্টা করিয়া দেখ না, যদি এখনই ধূলা (ধূলার ন্যায় বিনম্র) হইতে পার। যাহারা সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া থাকে, তাহাদের সমুন্নত মস্তক একদিন অবনত হইবেই হইবে।

ভীমাকৃতি জনৈক বলিষ্ঠ পুরুষ অপরের মুখে নিজের নিন্দাবাদ শ্রবণে ক্রোধে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিলে,

অন্য এক সাধু তাহাকে বলিল, তুমি তোমার বলিষ্ঠ স্কন্ধে শত সের পরিমিত ভার সহজে ধারণ করিতে পার, আর একটী ক্ষুদ্র বাক্যের ভার বহন করিতে পার না? তোমার বাহুতে অমিত বল দেখিতেছি, তোমার মুখ হইতে সুমিষ্ট বাক্য উচ্চারিত হউক। তোমাতে যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভাব থাকে, তবে তোমার বীরত্ব কোথায়? আদমের পুত্রেরা (মনুষ্যেরা) ধূলি হইতেই বিগঠিত। তাহার দেহে যদি ধূলির মত নম্রতা না থাকে, তবে সে আর মানুষ কিসের।

একজন সাধু অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভাই! সুফি (suffi) সম্প্রদায়স্থ লোকের (মুসলমানগণের ভিতরে ধর্ম্মপ্রাণ এক সম্প্রদায়) লক্ষণ কি? সে উত্তরে বলিল, তাহাদের মধ্যে হীনতম ব্যক্তিও নিজের সুখ-দুঃখে উদাসীন থাকিয়া অপরের সেবা করে।

যিনি ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরবিমুখ শত সহস্র আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ হইতেও প্রিয়তর।

কদভ্যাস একবার অর্জ্জিত হইলে মৃত্যু ভিন্ন তাহার আর প্রতীকার কোথায়?

সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি রাজার ঘৃণা-দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের ভিতর হইতে জনৈক সাধু সাহসের সহিত কহিল, রাজন! আড়ম্বর বাহুল্যে আপনি শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু আনন্দ ভোগে আমরাও শ্রেষ্ঠতর; মৃত্যুতে আমরা আপনার সমান, (মৃত্যুর অন্তে) বিচার দিনে, ঈশ্বরের কৃপায়, আমাদের ভবিষ্যৎ আপনা হইতেও উজ্জ্বলতর। আপনি দেশবিজয়ী এবং প্রাচুর্য্যের ভিতরে অবস্থিত; আর আমরা এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত। কিন্তু রাজ্য ছাড়িয়া নিজ সম্বল লইয়া পৃথিবী হইতে শেষ বিদায়ের দিনে আপনা হইতে অধিকতর আনন্দের সহিত আমরা যাত্রা করিতে পারিব।

ছিন্নবেশী কেশহীন সাধু তাহার আত্মাতে জীবিত —দেহে নহে। প্রকৃত সন্ন্যাসী কে—যিনি ঈশ্বরে চির-কৃতজ্ঞ, তাঁহার প্রশংসা ও পূজা নিরত, বিনম্র, সন্তুষ্ট, দানশীল, তাঁহার একত্বে, দয়াতে ও মঙ্গলস্বরূপে চিরবিশ্বাসী, সুখ দুঃখে তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরশীল এবং সকলের প্রতি ক্ষমাবান। তোমার পরিচ্ছদ চাকচিক্যময় হইল, তাহাতে কি? তোমার অন্তরে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই, বাহ্য পরিচ্ছদ লইয়া কি হইবে; তোমার গৃহের ভিতরে ছিন্ন কন্থা—তৃণশয্যা, দ্বারদেশে মূল্যবান পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া কি করিবে?

প্রস্ফুটিত গোলাপের সুন্দর তোড়া; তৃণের বাঁধনে ফুলের বৃন্তগুলি বাঁধা রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া একজন বলিল, তৃণ! তোমার এতবড় স্পর্দ্ধা, যে তুমি গোলাপের সহিত এক আসনে বসিতে চাও? তৃণ আক্ষেপ করিয়া বলিল মহাশয়! যাহারা প্রকৃত সাধু, তাহারা কোন অবস্থায় সঙ্গিগণকে বিস্মৃত নহেন। আমার সৌন্দর্য্য সুগন্ধ কিছুই নাই সত্য। কিন্তু গোলাপের উৎপত্তিস্থান যেখানে, সেই উদ্যানে আমি জন্মিয়াছি। আমি গোলাপের সহিত একত্রেই বর্দ্ধিত হইয়াছি। আমার নিজের কোন মূল্য নাই, তাহাতে কি! ঈশ্বরের উপরেই আমার সকল নির্ভর।

প্রভো! এ দাস বহুকাল ধরিয়া তোমার সেবা করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে এ ক্রীতদাসকে দয়া করিয়া মুক্তি দাও।

হে পৃথিবীর লোকেরা! তোমরা ঈশ্বরের পথ ধরিয়া চল। সেই দুর্ভাগ্যবান্, যে তাঁর পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়,—তাঁহার নিকটে যাইবার প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায় না।

দান করিতে বিরত হইও না। দ্রাক্ষালতাকে যতই ছাঁটিয়া দিবে, ততই উহা হইতে অসংখ্য ফল বাহির হইতে থাকিবে।

নানা কথা

ভোট বাগান। হাবড়া কলিকাতার অপরপারে অবস্থিত; হাবড়ার উত্তরে সালকিয়া নামক স্থানে ভোটবাগান বলিয়া একটি স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। উহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে Waddell সাহেব প্রণীত Lassa and its mysteries, p-15, নামক গ্রন্থে আভাস মিলে। ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইয়া আইসেন, বাণিজ্য ও রাজ্য বৃদ্ধির দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি রেনেল (Rennel) সাহেবকে দিয়া সমগ্র ভারতের মানচিত্র প্রস্তুত করান। তিনি তিব্বতের সহিত সখ্য ও বাণিজ্য বন্ধন স্থাপন করিবার জন্য ১৭৭০ সালে (Bogle) বগল ও হ্যামিলটন সাহেবকে তিব্বতে প্রেরণ করেন, রংপুরে একটি বৃহৎ বাজার স্থাপন করেন এবং তিব্বতীয় ব্যবসায়ীগণের ব্যবহার জন্য হাবড়ার অদূরে উদ্যানের ভিতরে একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করান। বগল সাহেবের বন্ধু তাসিলহুম্পুর প্রধান লামা (Grand Lama of Tashilhumpo) কর্ত্তৃক প্রেরিত কতকগুলি তিব্বতীয় পুস্তক ও দেবমূর্ত্তি ঐ মন্দির মধ্যে রক্ষিত

হয়। ১৭৭২ সালে ভুটিয়ারা কুচবিহার অধিকার করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া চলিয়া গেলে ইংরাজ সৈন্য অচিরে কুচবিহার প্রদেশ শত্রু হস্ত হইতে পুনরধিকার করে, অধিকন্তু ভোটগণকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু প্রধান লামার অনুরোধ আসিয়া পড়ায় ওয়ারেন হেষ্টিংশ সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তৎসত্ত্বেও তিব্বতের সহিত সখ্য ও অবাধ বাণিজ্যের আশা ভবিষ্যতে ফলবতী হয় নাই। ক্রমে ঐ উদ্যানস্থ মন্দির জীর্ণ হইয়া আসিলে উহার পূর্ব্ব ইতিহাস লোকে একপ্রকার বিস্মৃত হইয়া যায়। ১৮৮৭ সালে ঐ মন্দিরের ও উদ্যানের কথা পুনরুত্থাপিত হইলে দেখা যায়, পুস্তকাদি সমন্বিত তিব্বতীয় দেবমূর্ত্তি হিন্দুর দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে! যে স্থানে ঐ মন্দিরাদি স্থাপিত ছিল, তাহাই ভোটবাগান বলিয়া বর্ত্তমানে খ্যাত।

ভাষার উপর শীতের প্রভাব।—Waddell সাহেব বিগত তিব্বত যুদ্ধে লাসা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তিনি জনৈক সরকারি ডাক্তার। তাঁহার তিব্বত অভিযানের বিবরণ সমধিক গবেষণা পূর্ণ। তিনি তিব্বতের ভীষণ শীতের প্রকোপ সহ্য করিয়া নিজ অভিজ্ঞতা ও ভূরি দর্শনফলে অধিকন্তু তিব্বতীয় ও উত্তরমেরুর সন্নিকটস্থ রুষীয়-ভাষা আলোচনায় বলিতে চান, যে প্রচণ্ড শীতপ্রধান দেশের ভাষায় স্বরবর্ণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তত্রত্য দেশীয় লোকেরা মুখ না চাপিয়া কথা কহিতে পারে না। মুখ একটু বেশী উন্মুক্ত করিয়া কথা কহিলে নিদারুণ শীতল বায়ু মুখের ভিতরে প্রবেশ করে এবং দন্ত ও মুখবিবরকে সমধিক যাতনা দেয়। কাজেই ঐ সকল দেশের ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের আধিক্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে হইলে অধর ওষ্ঠ ও মুখগহ্বরকে যে অধিক প্রসারিত করিতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। Lassa its mysteries. P. 144. Third Edition.

স্বদেশী—এদেশে কার্পাসজাত বস্ত্রের দিন দিন আধিক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ১৯০১।২ ভারতের বিভিন্ন কলে প্রায় ৩৯॥০ কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯০৭।৮ সালে উহা ৬৫ কোটী গজে দাঁড়াইয়াছে। ধুতির পরিমাণও প্রায় ১০ কোটী হইতে ১৭ কোটী গজে পৌঁছিয়াছে।

মধু।—বিজ্ঞানযন্ত্রের সাহায্যে দেশের উৎপন্ন সামগ্রীকে যে প্রকারে সম্প্রসারিত ও সুলভ করিয়া তুলিতে হয় এবং তদ্দ্বারা স্বদেশকে যে প্রকারে ঐশ্বর্য্যশালী করা যায়, বর্ত্তমান ইউরোপ ও মার্কিন প্রদেশ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভারতের প্রকৃতি আমাদের অনুকূল। বলিতে কি উর্ব্বরশক্তিমূলক এই প্রকৃতির অনুগ্রহই আমাদিগকে অলস করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষিজাত অন্যান্য সামগ্রী ছাড়িয়া দিয়া মধু সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব। ভারতে অরণ্যের অভাব নাই, ফুল্ল কুসুমেরও অসদ্ভাব নাই। দেশের বিভিন্ন স্থানের স্বভাবজাত মধু সংগ্রহ করিয়াই আমরা পরিতৃপ্ত। কিন্তু এদেশে যাহা এক প্রকার অনায়াস-জাত, বিলাতে তাহা শ্রমজ পণ্য। "কৃষক" নামক একখানি বাঙ্গালা সুন্দর মাসিক পত্র বলেন, যে আমেরিকায় এমন অনেক লোক আছে, মধুচাষই যাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। তথাকার বৃহৎ বৃহৎ মক্ষিকাশালায় শত শত কৃত্রিম মধুচক্রে অসংখ্য মধুমক্ষিকা পরিপুষ্ট হইতেছে এবং ঐ সমস্ত মধুচক্র হইতে সমধিক পরিমাণে মধু সংগ্রহ হইতেছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মার্কিনে একটিও মক্ষিকাশালা ছিল না। কিন্তু আজ কাল তিন লক্ষ লোক ঐ চাষে নিযুক্ত; ১১০টি সমিতি, ৪ খানি সাময়িক পত্র, মধুচক্র ও তাহার যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের ১৫টি বাষ্পীয় কারখানা চলিতেছে ও তাহার ফলে প্রতিবৎসর দুই কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার মধু ও মোম উৎপন্ন ও বিক্রীত হইতেছে। ভারতীয় মক্ষিকা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মক্ষিকা নহে, অথচ ভারতের লোক এই ব্যবসায় সন্ধান পাইয়াও নিশ্চেষ্ট।

ভারতের দৈন্য।—প্রবুদ্ধ-ভারতের বিগত মে সংখ্যায় প্রকাশ যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক অধিবাসীর গড় বার্ষিক আয় দুই পাউণ্ড মাত্র। (ডিগ্‌বির মতে এক পাউণ্ড পাঁচ সিলিং দেড় পেন্স)। কিন্তু রুসিয়ার প্রতি অধিবাসীর বার্ষিক আয় গড়ে এগার পাউণ্ড, জর্ম্মানির বাইশ পাউণ্ড, ফ্রান্সের সাতাইশ পাউণ্ড, আমেরিকায় উনচল্লিশ পাউণ্ড, ইংলণ্ডের বিয়াল্লিশ পাউণ্ড।

ধর্ম্মপ্রচার।—ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে যে কি প্রকার অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন, খৃষ্টীয়-সমাজ তাহার পূর্ণ দৃষ্টান্তস্থল। Christian Life এর ৯ই মে সংখ্যায় প্রকাশ, যে ১৮০৭ সালে চীন দেশে একজনও প্রটেশটাণ্ট চীন-খৃষ্টান ছিল না। কিন্তু ১৮৬০ সালে তাহাদের সংখ্যা ৩০০ এবং ১৯০০ সালে নব্বুই সহস্র হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ নব্বুই হাজার হইয়া পড়িয়াছে। ধন্য উদ্যম ও চেষ্টা।

বিধবাবিবাহ। গত ১৯শে আষাঢ় লাহোরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার লালা রোসনলাল মহাশয়ের গৃহে আর্য্যসমাজের সভাসদ লালা গোপিমলের বিধবা কন্যার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের নাম লালা দেবীদয়াল, বি এ। ফেরোজপুর আর্য্যসমাজের উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনি প্রধান শিক্ষক।

দুর্ভিক্ষসভা। গত ১৩ই বৈশাখ মিরটের সুপ্রসিদ্ধ উকিল লালা সীতারাম মহাশয়ের নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ অকাল-সেবক নামে এক সভার অধিবেশন হয়। অনেকগুলি শিক্ষিত যুবক সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হন ও প্রতি পল্লী হইতে তাঁহাদিগের যত্নে এই মহদুদ্দেশ্যে ভিক্ষা সংগ্রহ হয়। ২৫ শে জৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩১০৮৴০ সংগৃহীত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ভিক্ষাদান করিয়াছেন।

সাহায্য। ভারত-দুর্ভিক্ষ-নিবারণ দাতব্য-ফণ্ড আবার যুক্ত ও মধ্য-প্রদেশ এবং মধ্য-ভারতের জন্য সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন।

অনাথাশ্রম। বোম্বাই প্রদেশে পুনা সহরের নিকটবর্ত্তী গান্ধারপুর নামকস্থানে কতিপয় স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্র লোক মিলিত হইয়া একটি হিন্দু অনাথ-বালক বালিকাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। রাও বহাদুর খাণ্ডে রাব্‌জী ভোসলে ইহার অধ্যক্ষ এবং বোম্বাই-গভর্ণর পৃষ্ঠ-পোষক মনোনীত হইয়াছেন।

মঠ। স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সম্প্রতি মুরশিদাবাদ অবস্থানকালে বহরমপুর ডিষ্ট্রীক্টের লালবাগ সব্‌ডিবিসনের গঙ্গাতীরবর্ত্তী বারনগর গ্রামে কতিপয় বৈষ্ণব-মন্দির ও মঠের ধ্বংশাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। খোদিত প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায়, যে অপেক্ষাকৃত বড় ও পুরাতন মঠটি প্রভু গৌরাঙ্গের সময়ে এবং অপরগুলি তাঁহার তিরোভাবের চল্লিশ বৎসর পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশে এক সময়ে রামদাস ভারতীর স্থাপিত বৈষ্ণব-বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। মঠগুলির প্রাচীর দালান ও কয়েকটি প্রকোষ্ঠ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভিতরের দেওয়ালগুলি বৈষ্ণবসাহিত্যকথিত স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তিতে অঙ্কিত। স্বামীজি তাঁহার এই কৌতুহলপূর্ণ আবিষ্কারের বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮, চৈত্র মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৯৬৮৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭১৫৮৵৩
সমষ্টি	...	৩১১২৮৴৯
ব্যয়	...	৩৯৫।৵৬
স্থিত	...	২৭১৭।৶৩

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের হাতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেন্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১১৭।৶৩

২৭১৭।৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২০০৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান

২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৲
পুস্তকালয়	...	২০৮৴৬
যন্ত্রালয়	...	১৫৬॥০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৪॥৵০
সমষ্টি	...	৩৯৬৮৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯৪।৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩১৮৴৩
পুস্তকালয়	...	৫॥৶০
যন্ত্রালয়	...	১৫২॥৴৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১১ ৻৩
সমষ্টি	...	৩৯৫।৵৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत् तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

মার্কস্ অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১। তোমার প্রত্যেক কার্য্যের যেন একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকে, এবং যে কার্য্য করিবে, ঐ জাতীয় কার্য্যের পক্ষে যেন উহা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হয়।

২। কেহ কেহ বিজনবাসের জন্য, জনশূন্য পল্লীপ্রদেশে, সমুদ্র-তীরে, কিংবা পর্ব্বতে গমন করিয়া থাকে; এবং তুমিও এইরূপ করিবে বলিয়া অনেক সময় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাক; কিন্তু আসলে ইহা একটা মনের খেয়াল বই আর কিছুই নহে। কেন না, তুমি ইচ্ছা করিলেই তোমার অন্তরের নিভৃত দেশে গিয়া বিশ্রাম করিতে পার। তোমার চিন্তাগুলি যদি এরূপ হয় যে, তাহাতে মনের শান্তি রক্ষিত হইতে পারে, মন সুব্যবস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে জানিবে, তোমার মন অপেক্ষা জন-কোলাহলশূন্য বিজন স্থান আর কোথাও নাই। অতএব, নিভৃত মন-আশ্রমে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধনা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা; এবং এই উদ্দেশ্যে, কতকগুলি ভাল ভাল তত্ত্বকথা তোমার বিজনবাসের সম্বল করিয়া রাখিবে। একটা দৃষ্টান্ত; কিসে তোমার মন উদ্বেজিত হইয়াছে?—সংসারের শঠতায়। ইহাই যদি তোমার উদ্বেগের কারণ হয়—তোমার বিষহারী ঔষধটা ত তোমার নিকটেই আছে। ইহাই বিবেচনা করিবে, পরস্পরের হিতের জন্যই, জ্ঞান-প্রধান জীবদিগের সৃষ্টি, ক্ষমা ন্যায়েরই একটা অংশ, এবং লোকে যে অন্যায় কার্য্য করে,সে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, কত লোক কলহ-বিবাদে, সন্দেহ ও শত্রুতায় তাহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়াছে; কিন্তু এখন তাহারা কোথায়?—তাহারা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছে। অতএব শান্ত হও, চিত্তকে আর বিচলিত করিও না। জগতের বর্ত্তমান ব্যবস্থাটা তোমার ভাল না-ও লাগিতে পারে। বিকল্পে অন্য ব্যবস্থা কি হইতে পারে, একবার ভাবিয়া দেখ:—হয় একজন বিধাতা, নয় কতকগুলা পরমাণু জগৎকে শাসন করিতেছে। জগৎ যে একটা সুব্যবস্থিত

নগরের মত শাসিত হইতেছে, তাহার কি অসংখ্য প্রমাণ এখনও পাও নাই ? তোমার শরীরের অসুস্থতাবশতঃ তুমি কি কষ্ট পাইতেছ ? যদি তোমার অন্তরাত্মা স্বকীয় শক্তি ও অধিকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে, তবে ইন্দ্রিয়-প্রবাহ অবাধে চলিতেছে, কি বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে তোমার আইসে-যায় কি ? তাহার পর, সুখ দুঃখের গূঢ় তত্ত্বটা একবার ভাবিয়া দেখ। তবে কি যশের জন্য তোমার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে ? তাহা যদি হইয়া থাকে, মনে করিয়া দেখ, পৃথিবীর জিনিস কত শীঘ্র অন্তর্হিত হয়—লোকে সে সমস্ত কত শীঘ্র ভুলিয়া যায়। মধ্যে অনন্তকাল, তাহার দুই পার্শ্বে বিস্মৃতির অতলস্পর্শ। লোক-প্রশংসা ! মনে করিয়া দেখ, উহা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, অল্পকাল স্থায়ী, অল্প পরিসরের মধ্যে বদ্ধ, এবং যাহাদের প্রশংসা চাহিতেছ, তাহারাও কি ক্ষুদ্রবুদ্ধি। সমস্ত পৃথিবী একটি বিন্দুমাত্র ; এই বিন্দুর মধ্যে আবার তোমার বাসস্থানটি কি ক্ষুদ্র, এবং সংখ্যা ও যোগ্যতায় তোমার ভক্তবৃন্দও কি অকিঞ্চিৎকর। মোদ্দা কথা,—বিশ্রামের জন্য, আপনার ক্ষুদ্র অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করিতে ভুলিও না। মানুষের মত, স্বাধীন জীবের মত, স্বাধীনভাবে সহজভাবে সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখ ; ইহার মধ্যে কোন যুঝাযুঝির ভাব নাই। তোমার অন্য পুঁজির মধ্যে এই দুইটি বীজ-মন্ত্রও যেন তোমার সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকে :—প্রথম, কোন বহির্বিষয় অন্তরাত্মাকে বিচলিত করিতে পারে না ; বহির্বিষয়গুলা বাহিরেই অচলভাবে অবস্থিতি করে ; চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ আত্মার অন্তর হইতেই—অন্তরের ভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়, কাল-যবনিকা এখনি পতিত হইবে, বর্ত্তমান দৃশ্যটি একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। তোমার জীবনের মধ্যে কত বড় বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তুমিত তাহা দেখিয়াছ। এক কথায়, জগতের সমস্তই শুধু রূপান্তর-পরম্পরা, জীবনটা অন্তরের ভাব বই আর কিছুই নহে।

৩। যদি বুদ্ধিবৃত্তিটা আমাদের সকলেরই সাধারণ-সামগ্রী হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিবৃত্তির হেতু যে প্রজ্ঞা, তাহাও অবশ্য আমাদের সাধারণ জিনিস হইবে ; এবং আর-একটা বুদ্ধি, যাহা বিধি-নিষেধের দ্বারা আমাদের আচরণকে নিয়মিত করে, সেই বিবেকবুদ্ধিও আমাদের সাধারণ সম্পত্তি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, সমস্ত মানবজাতিই একটা সাধারণ নিয়মের অধীন; তাহা যদি হইল, তবে সমস্ত জাতিই এক রাষ্ট্রের অধীন, সকলেই এক রাজ্যের প্রজা।

৪। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই প্রকৃতির গূঢ় রহস্য এবং উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য আছে। জীবন, যে সকল উপাদানকে একত্র সম্মিলিত করে, মৃত্যু সেইগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেয়—বিলীন করিয়া দেয়। অতএব ইহাতে এমন কিছুই নাই—যাহাতে মানুষ লজ্জা পাইতে পারে ;—এমন কিছুই নাই—যাহা জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং মানব-প্রকৃতির পরিকল্পনার বিরুদ্ধ।

৫। আচরণ ও মনের ভাব প্রায় একই জিনিস্ বলিলেই হয়। অমুক প্রকৃতির লোকের অমুক প্রকার আচরণ অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে যদি আশ্চর্য্য হও, তাহা হইলে, ডুমুর গাছ রসদান করে বলিয়াও তুমি আশ্চর্য্য হইবে। এটা যেন মনে থাকে, তুমি ও তোমার শত্রু উভয়ই মরিয়া পড়িবে ; এবং শীঘ্রই তোমাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

৬। তুমি ব্যথিত হইয়াছ বলিয়া মনে করিও না—তাহা হইলেই তোমার ব্যাথা চলিয়া যাইবে। ব্যাথা জানাইও না, দেখিবে তোমার ব্যথা আর নাই।

৭। যাহাতে মনুষ্যত্বের হীনতা হয়, তাহাতেই মানুষের প্রকৃত হীনতা। তা ছাড়া,—কি বাহিরে, কি অন্তরে,—মানুষের আর কোন অনিষ্টের কারণ নাই।

৮। এই দুইটি মূলমন্ত্র যেন তোমার জীবনের নিয়ামক হয় ঃ—প্রথমতঃ, তোমার অন্তরে যিনি নিয়ন্তারূপে, অধিপতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন,সেই বিবেকের আদেশ ও উপদেশ ছাড়া তুমি কোন কাজ করিবে না; যাহা মনুষ্যের পক্ষে হিতজনক, সেই কাজই করিবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি তোমার কোন বন্ধু তোমার মত-পরিবর্ত্তনের পক্ষে উৎকৃষ্ট হেতু দেখাইতে পারেন,তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মত পরিবর্ত্তন করিবে। সাধারণের হিত ও ন্যায়ধর্ম্মের খাতিরেই তুমি তোমার মত পরিবর্ত্তন করিতে পার, তোমার খেয়াল অনুসারে, কিংবা যশের জন্য মত পরিবর্ত্তন করিবে না।

৯। এখন তোমার প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে রহিয়াছে, ব্যষ্টিভাবে রহিয়াছে; শীঘ্রই উহা সমষ্টির মধ্যে মিশাইয়া যাইবে;—যে বিশ্ব প্রজ্ঞা হইতে তুমি জন্মলাভ করিয়াছ, তাহাতেই তুমি আবার প্রবেশ করিবে।

১০। জ্ঞানের কথা শুনিয়া চলিতে আরম্ভ কর;—এখন যাহারা তোমাকে বানর বলিয়া, পশু বলিয়া, অবজ্ঞা করিতেছে, তাহারাই আবার তোমাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে।

১১। দশ হাজার বৎসর যেন তুমি অনায়াসে অপব্যয় করিতে পার, এরূপভাবে কোন কাজ করিও না। মৃত্যু তোমার শিয়রে বসিয়া আছে। জীবন থাকিতে থাকিতেই একটা কিছু ভাল কাজ কর, এবং তাহা তুমি অনায়াসেই করিতে পার।

১২। যে পরছিদ্রানুসন্ধান না করিয়া, পরচর্চ্চা না করিয়া, কিসে আপনি ভাল হইবে, সৎ হইবে, সেই উদ্দেশে আপনার প্রতিই তাহার সমস্ত অন্তর্দ্দৃষ্টি নিয়োগ করে, সে ব্যক্তি কতটা সময় হাতে পায়, তাহার কাজ কত সহজ হইয়া পড়ে।

১৩। আমি মরিয়া গেলে, আমার কথা লইয়া সকলেই বলাবলি করিবে,—এই মনে করিয়া যাহারা আপনার স্মৃতির জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, তাহারা ভাবে না, তাহার পরিচিত লোক সকলই চলিয়া যাইবে। বংশপরম্পরাক্রমে তাহার যশ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকিবে; পর পর বংশ, যাহারা নিজেই যশের প্রার্থী, তাহারা পূর্ব্ববংশীয় লোকের যশকে লাঘব করিবে, এইরূপে সেই যশ একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। আচ্ছা, মানিলাম তোমার স্মৃতি অমর, তোমার ভক্ত লোকেরা অমর; কিন্তু তাহাদের প্রশংসায় তোমার কি লাভ? তোমার মৃত্যুর উত্তর-কালের কথা বলিতেছি না, মনে কর—তুমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই যদি খুব প্রশংসা পাও, সে প্রশংসায় যদি সাধারণের কোন হিত না হয়, তাহা হইলে সে প্রশংসার মূল্য কি?

১৪। যাহা কিছু ভাল, তাহা স্বতই ভাল; সে ভাল গুণ সে নিজের স্বরূপ হইতেই পাইয়াছে; লোকের প্রশংসা তাহার কোন অংশ নহে। অতএব শুধু প্রসংসিত হইয়াছে বলিয়া কোন জিনিস ভালও নহে, মন্দও নহে। ন্যায়, সত্য, সুশীলতা, সংযম—এই সমস্ত জিনিস কোন প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ যদি মাণিকের

গুণ কীর্ত্তন না করিয়া নীরব থাকে, তাহাতে মাণিকের উজ্জ্বলতার কি কিছু মাত্র লাঘব হয় ?

১৫। যদি মৃত্যুর পরেও মানব-আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে অনন্তকাল হইতে যে সকল আত্মা ক্রমাগত ইহ-লোক হইতে অপসৃত হইতেছে, তাহাদের জন্য আকাশে কি স্থানহ ইবে ? ভাল, আমি জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে যে এত লোক কবরস্থ হইতেছে তাহাদের জন্য কি স্থান হইতেছে না ? প্রত্যেক শব কিছুকাল থাকিয়া পরিবর্ত্তিত ও বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহার স্থান আবার অন্য শব আসিয়া অধিকার করিতেছে ; সেইরূপ যখন কোন মানুষ মরে, তাহার মুক্ত-আত্মা আকাশে চলিয়া যায়, তখন সে কিছুকাল সেই ভাবে থাকিয়া আবার পরিবর্ত্তিত হয়, পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, অনলশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয় ; অথবা বিশ্বের প্রজননী-শক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা পর-পর অন্য আত্মার জন্য স্থান ছাড়িয়া দেয়।

১৬। উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিও না ; তোমার উদ্দেশ্য যেন সৎ হয়, তোমার বিশ্বাস যেন ধ্রুব হয়।

১৭। হে বিশ্বপ্রকৃতি ! তোমার যাহা প্রীতিকর, আমার নিকটেও তাহাই প্রীতিকর। তুমি যাহা সময়োচিত বলিয়া মনে কর, আমি তাহা বেশী শীঘ্র আসিয়াছে, কিংবা বেশী বিলম্বে আসিয়াছে বলিয়া মনে করি না। হে বিশ্বপ্রকৃতি ! তোমার ঋতুরা যে সব ফল আনয়ন করে, তাহাই আমার পক্ষে উপাদেয়। তোমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তোমাতেই স্থিতি করে, এবং তোমাতেই পুনর্ব্বার প্রবেশ করে।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

দ্বিতীয়-উপদেশের অনুবৃত্তি।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ন্যায় অধিকার-বুদ্ধি সম্বন্ধেও, স্বার্থনীতি কোন সন্তোষ-জনক হিসাব দিতে পারে না। কেন না, কর্ত্তব্য ও অধিকার পরস্পরের সহিত অনুস্যূত।

শক্তি ও অধিকারকে একত্র মিশাইয়া ফেলিলে চলিবে না। কোন সত্তা ঝটিকার ন্যায়, বজ্রের ন্যায়, কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় শক্তিমান্ হইতে পারে ; কিন্তু যদি তাহার স্বাধীনতা না থাকে, তবে সে একটা ভীষণ জিনিস মাত্র, ব্যক্তি নহে ঃ—উহা অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের ভয় ও আশার উদ্রেক্ করিতে পারে ; কিন্তু সে আমাদের ভক্তির অধিকারী নহে ; তাহার প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও অধিকার বুদ্ধি—ইহারা দুই ভাই। স্বাধীনতাই উহাদের সাধারণ জননী। একই দিনে উহাদের জন্ম, একসঙ্গে উহাদের বৃদ্ধি, এক সঙ্গে উহাদের মরণ। এমন কি, এরূপও বলা যাইতে পারে, অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য ও আমার নিজের অধিকার একই জিনিস,—কেবল উহাদের মুখ, দুই বিভিন্ন দিকে। আমি যদি তোমার নিকট হইতে ভক্তিলাভের অধিকারী হই—প্রকারান্তরে কি এই কথাই বলা হইতেছে না, যে আমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য, কেননা, আমি এক জন স্বাধীন ব্যক্তি ? কিন্তু তুমিও একজন স্বাধীন ব্যক্তি ; অতএব আমার অধিকারের ও তোমার কর্ত্তব্যের ভিত্তি একই ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে।

একমাত্র স্বাধীনতার সম্বন্ধেই সকল

মনুষ্য সমান, আর সকল বিষয়েই মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। যেমন বৃক্ষের দুইটি পত্র সমান নহে, সেইরূপ কি শরীর, কি ইন্দ্রিয়াদি, কি মন, কি হৃদয়,—এই সকল বিষয়ে কোন দুইটি মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে সমান নহে। কিন্তু এক ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার সহিত অন্যব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার যে কোন পার্থক্য আছে—এ কথা মনে ধারণা করাও যায় না। হয় আমি স্বাধীন, নয় আমি স্বাধীন নই। যদি আমি স্বাধীন হই, আমি তোমারই মতন সমান স্বাধীন, এবং তুমিও আমারই মতন সমান স্বাধীন। উহার কিছুমাত্র কম বেশী নহে।

এই স্বাধীনতার অধিকার সূত্রেই এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সহিত সমান নীতিমান্। স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাভূমি যে ইচ্ছা, তাহা সকল মানুষের মধ্যেই সমান। এই ইচ্ছার সাধন পক্ষে—কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক—এরূপ বিভিন্ন উপায় থাকিতে পারে, এরূপ বিভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে—যাহা অসমান; কিন্তু যে সকল শক্তির সাহায্য লইয়া ইচ্ছা কাজ করে, সে সকল শক্তি স্বয়ং ইচ্ছা নহে; কেন না, সে সকল শক্তি ইচ্ছার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নহে। একমাত্র ইচ্ছার শক্তিই স্বাধীন শক্তি, এবং স্বরূপতঃ স্বাধীনতাই ইচ্ছার ধর্ম্ম। ইচ্ছা যদি কোন নিয়ম মানে, ত সে নিয়ম—প্রবৃত্তি-মূলক কিংবা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনামূলক নিয়ম নহে ঃ—সে নিয়ম মানসিক নিয়ম,—যেমন মনে কর, ন্যায় ধর্ম্মের নিয়ম; আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা, এই নিয়মটিকে মানে, এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানে যে, এই নিয়মটি পালন, কিংবা লঙ্ঘন করা তা'র সাধ্যায়ত্ত। ইহাই স্বাধীনতার আদর্শ এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত সাম্যেরও আদর্শ; অন্য আদর্শ একটা অলীক কথা মাত্র। এ কথা সত্য নহে যে, সমান ধনবান্, সমান বলবান্ ও সমান সুন্দর হইবার অধিকার—এক কথায়, সমানরূপে সুখভোগ করিবার, সুখী হইবার অধিকার সকলেরই আছে; কেন না, সুখসৌভাগ্য, ধন-ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিবার উপযোগিতা সম্বন্ধে,বিভিন্ন লোকের শক্তিসমার্থ্য ও প্রকৃতির মধ্যে বহুল তারতম্য লক্ষিত হয়। ঈশ্বর, সকল বিষয়েই অসমান শক্তি-বিশিষ্ট করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এস্থলে, সমতা প্রকৃতির বিরুদ্ধ,—জগতের চিরন্তন শৃঙ্খলার বিরুদ্ধ; যেরূপ সৌসামঞ্জস্য ও একতা—সেইরূপ বৈষম্য ও বিচিত্রতাও সৃষ্টির নিয়ম। এইরূপ আত্যন্তিক সমতার কল্পনা করা নিতান্তই বাতুলতা। যাহাদের হৃদয় ও মন প্রকৃতিস্থ নহে, যাহারা আত্মম্ভরী, যাহারা অত্যাকাঙ্ক্ষী,—মিথ্যা সাম্য, তাহাদেরই আরাধ্য পুত্তলী। প্রকৃত সাম্য, ঈশ্বর কৃত সমস্ত বাহ্য অসমতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে না,—সে সকল অসমতা অপনীত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। গর্ব্ব ও ঈর্ষ্যার প্রচণ্ড দুশ্চেষ্টার সহিত সংগ্রাম করা—উদার স্বাধীনতার আবশ্যক হয় না। কেন না, প্রকৃত স্বাধীনতা প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষী নহে, এবং সুখসৌভাগ্য, রূপ-লাবণ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে কাল্পনিক সমতা লাভেরও প্রত্যাশী নহে। তা'ছাড়া, এইরূপ সমতা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, প্রকৃত স্বাধীনতার চক্ষে উহার মূল্য যৎ-সামান্য; প্রকৃত স্বাধীনতা এমন কিছু চাহে—যাহা সুখ অপেক্ষা, সৌভাগ্য অপেক্ষা, পদমর্য্যাদা অপেক্ষা বড়—তাহা সম্মাননা-বুদ্ধি; যাহা কিছু লইয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বের পবিত্র অধিকারের প্রতিই স্বাধীনতা সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহে; কেন না, কোন ব্যক্তির

ব্যক্তিত্বই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে সাম্য,—ইহা ভিন্ন আর কিছুই চাহে না, কিছুরই দাবী করে না। সম্মাননা ও ভক্তিকে যেন আমরা একসামিল করিয়া না ফেলি। প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের চরণেই আমরা ভক্তি-অঞ্জলি প্রদান করি। আমি কেবল মনুষ্যত্বকেই সম্মান করি; অর্থাৎ স্বাধীন-প্রকৃতি মনুষ্যমাত্রকেই সম্মান করি; কেন না, মানুষের মধ্যে যাহা কিছু স্বাধীন নহে, তাহার সহিত মনুষ্যত্বের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা মনুষ্যত্বের বিপরীত ধর্ম্ম। অতএব যাহা কিছু মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিধান করে, ঠিক্ সেই বিষয়েই মানুষ মানুষের সমান। প্রকৃত সাম্য, এমন জিনিসের প্রতি সম্মান করিতে বলে, যাহা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান; কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি কুৎসিত কি সুন্দর, কি ধনী কি দরিদ্র, কি প্রতিভাশালী ব্যক্তি, কি সাধারণ মনুষ্য, কি স্ত্রী কি পুরুষ—যে-কেহ আপনাকে জিনিস বলিয়া নহে—পরন্তু ব্যক্তি বলিয়া জানে,—প্রকৃত সাম্য তাহাকেই সম্মান করিতে আদেশ করে। সাধারণ স্বাধীনতার প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন—ইহা, কি কর্ত্তব্যবুদ্ধি কি অধিকার-বুদ্ধি—উভয়েরই নিয়ম; ইহা প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম ও সকলেরই নিরাপদ আশ্রয় স্থান; মনুষ্যগণের মধ্যে ইহাই আত্মমর্য্যাদা, ও ধরা-মাঝে ইহাই শান্তিরূপে বিরাজমান। এই বিষয়ে একটা আশ্চর্য্য ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহান্ ও পবিত্র স্বাধীনতার উদ্দেশেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের হৃদয়, সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের হৃদয়,মনুষ্যের প্রকৃত হিতকামী ব্যক্তিদিগের হৃদয় এক সময়ে বিস্পন্দিত হইয়াছিল। প্লেটোর উচ্চ কল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া, মন্‌টেস্‌ক্যুর সারবান্ চিন্তা-সমূহ পর্য্যন্ত, গ্রীসের ক্ষুদ্রতম নগরের উদার ব্যবস্থাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া, ফরাসী বিপ্লবের অবিনশ্বর "মনুষ্যের অধিকার" ঘোষণা পর্য্যন্ত—যুগযুগান্তরকালের মধ্য দিয়া,—প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র এই আদর্শকেই চিরকাল অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে।

ইন্দ্রিয়বোধের দর্শনশাস্ত্র যে মূলতত্ত্ব হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পরিণাম যেমন অনিষ্টজনক, স্বাধীনতার মূলতত্ত্বের পরিণাম তেমনই হিতকর। ইচ্ছা ও বাসনাকে এক-সামিল করিয়া ফেলিয়া, উক্ত দর্শনতন্ত্র প্রকারান্তরে—ঠিক্ যেটি স্বাধীনতার বিপরীত, সেই উদ্দাম প্রকৃতির সমর্থন করিয়াছে; ঐ দর্শনশাস্ত্র, সমস্ত বাসনা ও সমস্ত প্রবৃত্তির বন্ধন-শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়াছে; কল্পনা হইতে, হৃদয় হইতে, রাশরজ্জু উঠাইয়া লইয়াছে; ইহারই শিক্ষা-প্রভাবে, মানুষ প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞার দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছে, জনসমাজকে অরাজকতার দিকে, কিংবা অত্যাচার-উৎপীড়নের দিকে ক্রমাগত ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, বাসনা জন্মাইবার পর, স্বার্থ-বুদ্ধি আমাদিগকে কোথায় লইয়া যায়? অবশ্য, সম্পূর্ণরূপে সুখী হই, ইহাই আমাদের মনের বাসনা। তাহার পর, স্বার্থবুদ্ধি আসিয়া বলে, যে কোন উপায়েই হউক, (কেবল যাহাতে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা ছাড়া) সুখী হইবার চেষ্টা করিতে হইবে; যদি আমি মানুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ হইয়া থাকি, তাহা হইলে উহার দ্বারা আমার যে সুবিধা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। যদি অদৃষ্ট-

ক্রমে আমি নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমার তেমন সুখ-সম্পদ না থাকে, যদি আমার কোন বিষয়ে তেমন কোন স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকে, অথচ যদি আমার বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা অসীম হয়—(কেন না, বাসনার অন্ত নাই) তখন আমি আপনাকে দুর্ভাগ্যবান্ মনে করিয়া, আমার সাংসারিক অবস্থাকে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করি, আমার মনে নানা প্রকার কল্পনার স্বপ্ন জাগিয়া উঠে; আমি চাই, সমস্ত সংসার ওলট্‌পালট্ হইয়া যায়; বৃথা গর্ব্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে; অবশ্য আমি প্রচণ্ড রাষ্ট্র-নৈতিক বিপ্লব চাহি না; কেন না, তাহা আমার স্বার্থের অনুকূল নহে। মনে কর, অশেষ চেষ্টা করিয়া অবশেষে আমি সুখ-সৌভাগ্য ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিলাম। পূর্ব্বে স্বার্থবুদ্ধি যেমন আমাকে নানা-বিধ চেষ্টা-আন্দোলনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, এক্ষণে আবার যাহাতে আমি নিরাপদে থাকিতে পারি, আমার স্বার্থবুদ্ধি তাহাই চাহিতে লাগিল। এক্ষণে নিরাপদ হইবার আকাঙ্ক্ষা,—আমাকে অরাজকতার পক্ষ হইতে সুশাসনের পক্ষে আনয়ন করিল; অবশ্য আমি সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের পক্ষ অবলম্বন করি,—শুধু উহা আমার স্বার্থের অনুকূল বলিয়াই; এই স্বার্থ বুদ্ধির কথাতেই —আমার সাধ্য হইলে—আমি অত্যাচারী প্রভু হইতেও পারি, কোন অত্যাচারী প্রভুর স্বর্ণালঙ্কারবিভূষিত দাস হইতেও পারি। অরাজকতা ও অত্যাচার, স্বাধীনতা-পথের এই যে দুই মহাবিঘ্ন, উহার প্রতিরোধের এক মাত্র দুর্গ—স্বত্বাধিকারের বিশ্বজনীন ভাব;—উহা ভাল মন্দের প্রভেদের উপর, ন্যায় ও উপযোগিতার প্রভেদের উপর, হিতকারিতা ও মনোহারিতার প্রভেদের উপর, ধর্ম্ম ও স্বার্থের প্রভেদের উপর, ইচ্ছা ও বাসনার প্রভেদের উপর, এবং ইন্দ্রিয়-বোধ ও আত্মচৈতন্যের প্রভেদের উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত।

(ক্রমশঃ)

পরম পিতা।

যাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করা যায়, তিনি পিতা। যিনি অন্নদান করেন, ভয়ে ভীত হইলে, যিনি অভয়দান করেন, সেই অন্নদাতা এবং ভয়ত্রাতাকেও পিতা বলা হয়। ব্রহ্ম-বিদ্যায় দীক্ষিত করিবার জন্য যিনি বিদ্যার অধিকারে উপনীত করেন, মাণবক যাঁহার চরণ-প্রান্তে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার-লাভার্থ উপনীত হয়, তিনিও পিতা সাকল্যে ব্যবহারক্ষেত্রে—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনিতা চোপনীতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥"

এই পাঁচটি পৃথক্ পুরুষ পিতার মহনীয় আসনে সমাসীন। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত করেন, তিনিই গরিষ্ঠ পিতা। মনু বলিয়াছেন;—

"উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥
কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্ যদ্ যোনাবভিজায়তে॥
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্ বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাঽজরাঽমরা॥
ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।
বলোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্ম্মতঃ॥"

(২ অঃ, ১৪৬—১৫০)

'উৎপাদক ও ব্রহ্মদাতার মধ্যে ব্রহ্ম-দানকারী পিতাই গরীয়ান্; যে হেতু, জ্ঞানকাম ব্যক্তির ব্রহ্মজন্ম ইহলোক ও পর-লোক, উভয় লোকেই শাশ্বত—নিত্যস্থায়ী।

বালক যে মনুষ্যযোনিতে অভিজাত হয়,সেটা তাহার অভিব্যক্তি মাত্র। বেদপারগ আচার্য্য জগতের প্রসবকারিণী ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে তাহার যে উন্নতিরূপ জাতির উৎপাদন করেন, সেই জাতিই সত্য; কারণ, সে জাতির বার্দ্ধক্য বা মরণ নাই। অতএব ব্রাহ্ম-জন্মের কর্ত্তা, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুশাসিতা জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্ম শিশুও জ্ঞানহীন বয়োবৃদ্ধের ধর্ম্মতঃ পিতা হয়।' সেই গরিষ্ঠ-পিতা-ব্রহ্মদাতারও পিতা পর-ব্রহ্ম। ব্রহ্মদাতাও একদিন ব্রহ্মজন্ম লাভের জন্য আচার্য্যের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মী-জাতি লাভ করিয়া গরিষ্ঠ হইয়াছিলেন; সুতরাং যাঁহার জ্ঞান, যাঁহার পবিত্রতা, যাঁহার মঙ্গলভাব, ও যাঁহার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিয়া, যাঁহাকে জীবন্ত ঈশ্বররূপে দেখিয়া আচার্য্য গরীয়ান্ হইয়াছেন, যে বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গল ইচ্ছাতে মানবজন্ম ধারণ করিয়া আমাদিগের আচার্য্য হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানে ও পবিত্রতায়, মঙ্গলভাবে ও স্বতন্ত্রতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গরীয়ান্ পিতা;—এই জন্য পরম-পিতা।

এই পরম-পিতাই বিশৃঙ্খলাবহুল বিশ্বসংসারের উন্মত্ত শক্তিপুঞ্জকে শাসিত করিয়া, সকল কার্য্যের অনুগামী ও কার্য্যকারী করেন বলিয়া বিশ্বনিয়ন্তা, এবং বিশ্বসংসারের প্রত্যেক কার্য্য,নিজের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে রাখিয়া, সম্পাদন করান বলিয়া সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ। অতএব ইনি পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম।

যাঁহারা ঈশ্বরকে পরমপুরুষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সৃষ্টির ভাব মনে করিতে গিয়া নানা ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা প্রকৃতির অতীত স্বতন্ত্র এক পূর্ণ শক্তিকে না দেখিয়া, প্রকৃতির রাজ্য হইতে সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন, বীজ হইতে যেমন ব্রীহিযবাদি-বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; সেইরূপ ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর বাধ্য হইয়া জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

অনেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের পার্থক্য দেখিতে না পাইয়া, ঈশ্বর ও জগৎকে এক করিয়া ফেলেন।

অনেকে জগৎ-কারণকে এক অন্ধ শক্তির ন্যায় বিবেচনা করেন।

তাঁহাদিগের সহিত ব্রাহ্মের বিশেষ মতভেদ আছে। ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগের সেই সকল কল্পিত মতের অনুমোদন করিতে পারেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে অন্যপ্রকার উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম, এক অন্ধ দৈব শক্তিকে জগতের আদিকারণ বলেন না; কিন্তু এক মহান্ পুরুষের ইচ্ছা, জগৎ-সৃষ্টির মূলে দেদীপ্যমান দেখেন। "তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, বহু হইব—প্রজাত হইব। ঈক্ষণ করা এবং জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বের প্রেরণায় মঙ্গলময় ইচ্ছা করা—একই কথা। যেখানে জ্ঞান নাই, কর্ত্তৃত্বের তীব্র তাড়না নাই, সেখানে মঙ্গলময়ী মহদিচ্ছাও নাই। অজ্ঞানের ঘন অন্ধকারে মঙ্গলের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় না; প্রমত্তের অশুভ ইচ্ছা বিকশিত হইতে পারে।—সেইরূপ কর্ত্তৃত্বের উদ্দাম প্রেরণাও যেখানে নাই, সেখানেই বা ইচ্ছার মঙ্গলভাব কিরূপে উপলব্ধি করা যাইবে? উন্মত্তের যাদৃচ্ছিক প্রেরণায় কোথাও কি মঙ্গলময় ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়? সুতরাং সেই মহান্ পুরুষের সৎ-ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান, কর্ত্তৃত্ব এবং মঙ্গল-ভাব, এসকলই আছে। অতএব বলিতে হয়, সেই স্বতন্ত্র-শক্তি, সেই পরম-পুরুষ, সেই জীবন্ত ঈশ্বরই পরম কারণ।

তিনি বাধ্য হইয়া এ জগৎ সৃষ্টি করেন নাই ; কিন্তু অপর কাহারও সাহায্য ব্যতীত, আপন ইচ্ছায়, আপন মঙ্গলভাবে, এই সমস্ত রচনা করিয়া আপন কর্তৃত্বের দায়িত্বভার লাঘব করিয়াছেন।

তিনি অন্য কাহারও দ্বারা নিয়মিত হন নাই ; কিন্তু আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়া দ্বারাই এই সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।" তাঁহার প্রখর জ্ঞান, তাঁহার অপ্রতিহত বল বীর্য্য, এবং অব্যভিচরিত ক্রিয়া তাঁহার স্বভাবানুগত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অমিতবল এবং ক্রিয়াযোগী বা সর্ব্বকর্ম্মক্ষম ; এই জন্য তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা কখনই বিঘ্নবিহত বা নিষ্ফল হয় না।

তিনি আলোচনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আলোচনা করিয়াই তাঁহার মঙ্গলভাব সম্পন্ন করিতে সকলকে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গল-নিয়মে সকলেই নিয়মিত হইয়া, তাঁহারই মঙ্গলময় শাসনের প্রচার করিতেছে। সূর্য্য তাঁহারই মঙ্গলময় আদেশে, তাঁহার মঙ্গলময় ভাবের আলোচনা করিয়া, প্রত্যহ তাঁহারই সৃষ্টির মঙ্গলভাব সম্পন্ন করিতেছে ; তাঁহার মঙ্গল-শাসন অতিক্রম করিতে না পারিয়া, মঙ্গলময় নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। তাঁহার স্নেহসুধার আধার ঐ চন্দ্র, ওষধির পোষণ করিতেছে ; তাঁহার সদিচ্ছার কণামাত্র আভাস পাইয়া এই বায়ু, মঙ্গলময় প্রাণের বিতরণ কার্য্যে নিযুক্ত ; তাঁহার প্রেমতরঙ্গিণীর ক্ষুদ্র একটা ঊর্ম্মির অনুসন্ধান পাইয়া, তাঁহার প্রেমে দ্রবীভূত ঐ বরুণ, মঙ্গলময় জীবনের অবাধ-প্রসারণকারী। জগতের মঙ্গল আলোচনায় জগৎ অনন্যমনস্ক ; কখনই সেই পরম-পিতার মঙ্গলময় আদেশের প্রতিকূল হইবার ইচ্ছাও করে না। যে যখনই তাঁহার মঙ্গলময় আদেশের আলোচনায় বহির্ম্মুখ হয়, পরম পিতা তখনই তাহার নিকটে "মহদ্ভয়ং বজ্রমিব" মহদ্ভয় বজ্রের ন্যায় আবির্ভূত হন। তলবকারোপনিষদে দেখিতে পাই,—ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ আদি দেবতাগণ দেবাসুর-সংগ্রামে পরমপিতার ইঙ্গিতে জয়লাভ করিয়া, সে মহিমা তাঁহাদিগেরই, পরমপিতার মঙ্গলময় ইচ্ছার মহিমায় নহে, ভাবিয়াছিলেন। অমনই পরম-পিতা দেবগণকে আপন মঙ্গলময় শাসনের অনুগামী করিবার জন্য 'অদৃষ্টপূর্ব্ব পূজ্য' তেজঃপুঞ্জরূপে আত্মবিকাশ করিলেন। দেবগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া জানিবার চেষ্টা করিলেন। জানিলে, ভয়ের মাত্রার লাঘব হয় ; কিন্তু কেহই জানিতে পারিলেন না, তিনি যে কে ; তাহা প্রত্যক্ষতঃ কেহই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না।

যখন আবার তাঁহার মঙ্গলময় অনুশাসনের মধ্যে দেবগণ আসিলেন, তখন তিনি 'বহুশোভমানা হৈমবতী' উমারূপে—ব্রহ্মবিদ্যারূপে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া দিলেন, তিনি কে ?—এইরূপ জগতের প্রত্যেক স্থানেই তিনি মহদ্ভয় উদ্যত বজ্রের ন্যায় বিদ্যমান আছেন। আবশ্যক হইলেই আত্মপ্রকাশ করিয়া শিক্ষা দিবেন। সেইরূপ সমস্ত মঙ্গলের নিধানও সেই পরম-পিতা। তিনি ভীতের অভয় দান করেন ; বুভুক্ষুকে অন্নদান তিনিই করেন ; তাঁহারই ঔরসজাত ব্রাহ্মীকলার পরিণয় করিয়া সকলে গৃহস্থ হয় ; তিনিই জন্মদাতা প্রত্যক্ষ-দেবতা—পিতা। যদি কেহ অভয়দাতা এজগতে থাকে, তবে সে তাঁহারই মঙ্গলময় অনুশাসনে নিয়মিত হইয়া ; যদি কেহ অন্নদাতা এজগতে আত্মপ্রকাশ করে, তবে সে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় ইচ্ছার মহতী

প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া; সুতরাং সেই পরম-অভয়দাতা ও পরম-অন্নদাতাকে পরম-পিতা বলিব, না ত' কাহাকে পরম-পিতা বলিব? অন্য যাহাকেই পরম-পিতা বলি না, তিনি কোনও একজন মহানের মহতী প্রেরণার অনুগামী বলিয়া; কিন্তু তিনিও যেখানে পরিমিত বা ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হন, সেখানে ত তিনি 'পরম' নহেন—সর্ব্বাতিশয়িত মহান্ নহেন। অতএব যিনি কুত্রাপি পরিমিত—ক্ষুদ্র নহেন, যিনি অন্যের প্রেরণা দান করেন, যাঁহাকে অন্যে প্রেরণা দান করিতে পারে না, যাঁহাতে অপরিসীম মঙ্গল-ভাব পূর্ণ অবস্থায় বিরাজিত, ব্রাহ্মী জাতি-লাভের যিনি মূল কারণ, যাঁহার মঙ্গলে জগতের মঙ্গল, যাঁহার আনন্দে জগৎ আনন্দিত—উজ্জীবিত, সেই জগৎপ্রাণ, প্রকৃতির অধীশ্বর, আনন্দময়, বিদ্যাশরীর এক, অদ্বৈত পরব্রহ্মই আমাদিগের পরম-পিতা। জগৎ তাঁহার মঙ্গল আলোচনায় নিযুক্ত; তিনি জগতের মঙ্গলরূপে আরও প্রকাশিত হউন। জগৎ মঙ্গলময় হউক; জগৎ আনন্দময় হউক; জগতের তিনি হউন; জগৎ তাঁহার হউক; আনন্দসাগরে আনন্দনদী মিলিয়া যাক; মঙ্গল মঙ্গলের জন্য হউক; আনন্দ আনন্দের জন্যই বিরাজিত থাকুক; অপূর্ণ সম্পূর্ণ হউক।

SERMONS OF MAHARSHI DEVENDRA NATH TAGORE

(TRANSLATED FROM BENGALI,)

"ন তং বিদাথ যইমা জজানান্যং যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাচাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥"

(ঋগ্বেদঃ ১ম, ৬ অ, ৮৩ সূঃ।)

"Him you know not who created all this world, Who dwelleth in your souls distinct from all else. You go about the world enveloped in a cloud, engaged in wrangling, addicted to the pleasures of life and engrossed in ceremonial observances."

O Men, Him you know not, who created heaven and earth and all that is in them. By His will the sun shines and illumines this world; by His will the moon sheds her ambrosial light by night, nourishing plants and trees; by His will at the close of the summer-season the clouds, driven by the wind, pour down welcome showers to allay the heat; by His will rivers flow from snowy mountains to irrigate and fertilize the earth; by His will the trees of the forest and the garden put forth flowers breathing delightful fragrance and bear fruits delicious to the taste; by His will the mother-earth supports countless beings with her inexhaustible stores of fruitful harvest; by His will a mother's love, flowing out with the milk of her breast, sustains the life of her infant; by His will man, endowed with wisdom and righteousness, has risen higher than brutes in the scale of existence; by His will heaven and earth, the minutes and the hours, the years and the seasons run on smoothly in their several courses. Alas! you know Him not, though He dwells within your inmost souls.

"YUSHMAKAM ANTARAM VABHUVA"

He dwelleth within you, distinct from all else, in the inmost recesses of your souls. The God who dwelleth within your heart of hearts, you know not; and how should you know Him, when you go about the world enveloped in the darkness of ignorance, as in a thick cloud, engaged in vain wrangling, allured by pleasures of the senses and spending your days in a round of useless rites and ceremonies. If you wish to know the Highest, the Para-Brahma, you must enrich your minds with wisdom and knowledge, embrace the truth in word and in deed, bring your senses under the subjection of moral laws, and renouncing all desire for heaven, pray and strive for true Salvation (mukti). Such are the precepts of the Rishis of old. The latter-day sages also speak in the same strain:—

ধিক্ ধিক্ জীবন ব্রহ্ম না জানো, হৃদয় দেশমে সো না উপাসো, পাস দূর কর মানো—

Woe to thy life, that thou should'st not know *Brahma*, that thou should'st not worship Him in the sanctuary of thy heart, deeming far One who is so near.

He, who dwelleth within and pervadeth the sky, the sun, moon, and stars, the air, fire, and water, the light and darkness, and ruleth them from within, whose manifestation they are and yet they know Him not, He is the Being that dwells within each of you, as your inner-soul. This Antar-yamin, the inner-guide, the immortal Being is in close contact with our souls. He cannot be touched with the outer hand, but we can feel Him and realise His presence in our souls. The Yogi, who detaches himself from the world, enjoys the boundless happiness of transcendental communion with Brahma. He is 'Arupa,' without form and without colour. He is neither white nor yellow, nor blue nor red ; this formless and colourless Being is by no means visible to the fleshly eye, but to the eye of wisdom He is revealed as the embodiment of joy and immortality. The blessed saint who has seen His form of Truth and Love remains absorbed in his Beloved for ever and ever. The beauty of that Supreme Love is beyond compare. It knows no increase nor decrease. The resplendent sun and moon, the forest blooming with flowers, the lily of the lake with its thousand petals, (satadala), all earthly Youth, Beauty and Grace, are but faint reflections of that divine Beauty. The love that is fixed on that Beauty never fades. He is without Rasa (flavour), and cannot be tasted as we taste water, fruit or honey ; but He is 'Rasa' itself, the very essence of sweetness. He, who has tasted that essence is blessed with joy everlasting. He is without odour (Agandha) but the morning flowers are charged with balmy fragrance by coming in contact with Him. He is without sound (Asavda); but He dwells in the souls of men and women and silently conveys these Commandments to their conscience:—

Speak the Truth—Do the right. Righteousness is the highest of all, and is honey-sweet for all. Thou shalt not earn money by unjust means. Thou shalt not covet thy neighbour's riches, nor be jealous of his good fortune. Forgive one another's trespasses. Thou shalt not commit adultery, nor indulge in intoxicating drink. Acquire knowledge with diligence. Bear thy burden of duty with patience. Be moderate in food and recreation. Do thy house-work with cheerfulness and wifely devotion. Forbear from quarrelling, wrangling and foolish talk. Be queen of thy house-hold, devoted to goodworks and armed with self-control. Obey and honour thine elders Pity the poor and down-trodden. Give up extravagant and miserly habits. Neglect not thy temporal and spritual welfare. Shrink not from sacrificing life itself at the call of Duty.

Such are the silent admonitions of the Spirit in every soul. He who performs his life-work in obedience to these commandments, conquers death. What though his body be slain, he reaches the Immortal regions, bearing the Life of his life within his soul.

This Supreme Spirit cannot be known by fine speech, nor by understanding, nor by much learning. He alone knows, unto whom the Spirit reveals Himself. And knowing Him, he is fired with zeal and enthusiasm to proclaim the glory of his Beloved. And to whom doth He reveal Himself ? To him, who hungers and thirsts after the Lord, doth He reveal himself, in his infinite Majesty.

O worship Him, the Infinite Spirit, the First Cause increate, whose works these are. Let us worship in a tranquil spirit, Him who is Peace and Rest.

আত্মজ্ঞানেই সুখ।

জগতে জীবকে দুঃখের অভিঘাত সহিতে হয়। যতদিন শরীর, ততদিন দুঃখ-ভোগ জীবের অবশ্যম্ভাবী। আমরা দুঃখ চাই না, সুখই চাই; কিন্তু সুখ জগতে অতি বিরল। যে সুখ আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে সুখ ক্ষণেকের নিমিত্ত; সুতরাং দুঃখ পক্ষেই ধর্ত্তব্য। মানবের জন্ম হইতে

মৃত্যু পর্য্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং জীবের দেহত্যাগ, অর্থাৎ মৃত্যুই দুঃখের অবসানকারী।

তবে কি জীবের আজন্মকাল দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে? ইহার নিবৃত্তির উপায় কি নাই? আছে, ইহার একমাত্র অতি সুন্দর উপায় আছে; তাহা আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের বলেই জীব দুঃখের কবল হইতে রক্ষা পায়। সে অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কর্ত্তা নই, ভোক্তা নই, আমার নিজের কোন ব্যাপার নাই। আমার সমস্ত কর্ত্তৃত্বই, সেই মূল কর্ত্তা জগৎ-কর্ত্তার ইচ্ছাধীন। আমার সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের ইচ্ছা-সম্ভূত। শুদ্ধ এই ভাবই মনুষ্যকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করে। সে ব্যক্তি এই সংসারে যে তাহার কতদূর সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারে, এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখে কোন প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করে না। সে ব্যক্তি ব্রহ্মচারীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, অথবা অরণ্যবাসীই হউন, তিনি জ্ঞানী পুরুষ।

আমাদের এক "আমি" ছাড়া যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাই জড়। জড়ের ধ্বংস আছে। "আমি" নিত্য এবং চৈতন্যরূপ; "আমার" ধ্বংস নাই; "আমি" চির অমর; ঈশ্বরের মঙ্গলভাব পূর্ণ করিবার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছি; কিন্তু এই দেহরূপী আমি প্রকৃতপক্ষে "আমি" নহি।

"আমি আছি" বলিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমার আমিত্ব প্রমাণ করিতে এক আমিই তা'র প্রমাণ। সেই আমি, অর্থাৎ যে শক্তি আমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে, সে শক্তিই আমার জ্ঞান। এইরূপে ক্রমে আত্মজ্ঞানের বহু সাধনায় পরমাত্মজ্ঞান লাভ করা যায় ও জীব উন্নত হয়। তখন তাহার সাংসারিক শোক দুঃখ দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট-জীবন কখন ম্রিয়মাণ হয় না, তখন সে ব্যক্তি পরম সুখী। সে সুখ এই জগতের সুখ নহে, সে পারলৌকিক সুখ। সে সুখে স্বার্থ নাই, সে সুখে দুঃখ নাই, সে সুখ মহৎ সুখ। সেই প্রকৃত সুখী জনকে আমি স্বাধীন বলি। এরূপ জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কাম, স্বাধীন ব্যক্তি অতি বিরল।

মানব স্বভাবতঃ ভ্রমান্ধ; এবং তুচ্ছ বস্তুর নিকট সে পরাধীন। জগৎপিতা আমাদের বুদ্ধি দিয়াছেন—শ্রেয়-বিষয়ে যোগ দিবার জন্য; কিন্তু আমরা স্বার্থেতে মজিয়া ও মায়া-মোহের বন্ধনে জড়ীভূত হইয়া স্রষ্টাকে ভুলিয়া যাই ও সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য যে জ্ঞান ও ধর্ম্মসাধন, তাহা ভুলিয়া গিয়া আজীবন দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করিতে থাকি। মেঘের মত আঁধার হিয়া চির-অন্ধ হইয়া পড়ে। সে হৃদয়ে পরম বিদ্যুৎ কখন ঝলসিত হয় না, সে হৃদয়াকাশে কখন চন্দ্রমা হাসে না, সেখানে কখন পরমপিতার আবির্ভাব হয় না। হে আমার ভ্রমান্ধ মন! সংসারের অন্তরালে সেই দেবপথ ধর, যদি বাঁচিতে চাও। নতুবা তোমার জীবন বৃথা—জীবন ধারণ করিয়াও তুমি মৃত। ইহা অপেক্ষা পরিতাপ আর কি হইতে পারে? হে দেব! অন্তরে পরমাত্মার জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত কর। সকল সংশয়-তিমির মিটিয়া যাউক, ধ্রুব বিশ্বাসের অগ্নির মধ্যে যেন দেখি, এক মহান্ অনন্তর-শোভন পরম জ্যোতি প্রদীপ্ত রহিয়াছে, তখনই দুঃখের কবল হইতে রক্ষা পাইব। ইহা ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় গতি নাই।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম।

বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন সে দিন কলিকাতায় যে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। আমরা ভাষায় তাহার সারাংশ নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম। "বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি এই ভারত; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এ ধর্ম্ম এ দেশ হইতে এককালে নির্ব্বাসিত। বুদ্ধদেব নিজেই ইহার এরূপ ঘোর পরিণাম পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শিষ্য মহাকাশ্যপ (অমু বুদ্ধ) কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে বুদ্ধদেব নিজেই বলিয়াছিলেন যে, যখন পুরুষ ও স্ত্রী ভিক্ষু ও উপাসকগণ বুদ্ধে শ্রদ্ধাহীন হইবে, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপর আস্থা হারাইবে, সমাধি-জীবনে বীতরাগ হইবে, ধর্ম্মোপদেশে বিমুখ হইবে, তখনই এই ধর্ম্ম বিলয়দশা প্রাপ্ত হইবে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস বা ঝটিকাবলে এ ধর্ম্মের ধ্বংস সাধন হইবে না; কিন্তু মূর্খ ও নির্ব্বোধের আবির্ভাবে এ ধর্ম্ম হত হইবেন। তাহারা এ ধর্ম্মকে নিষ্কলঙ্কে থাকিতে দিবে না।" বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ পুরোহিত দীপাঙ্কর একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে আহূত হইয়া যাইবার প্রাক্‌কালে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন যে,মুসলমানগণের আগমনে, ধর্ম্মের প্রতি ভিক্ষুদিগের অপ্রীতিফলে—তন্ত্র-মন্ত্রের অনুপ্রবেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সত্য সত্যই তাহা ফলিয়াছে। বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণপ্রায় আলোক এই ভারতে নিতান্ত ম্লান জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে এই বৌদ্ধধর্ম্মের অমিত-প্রতাপ ছিল। সপ্তমশতাব্দীতে দেখিতে পাই শীলাদিত্যের সভায় একবিংশতি করদরাজা সমুপস্থিত। তাঁহাদের সঙ্গে অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিত, যোগী ও ভিক্ষু। তৃতীয় হইতে সপ্তমশতাব্দীপর্য্যন্ত দক্ষিণভারতে পল্লব বংশীয়গণের (Pallava dynasty) সহায়তায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের দারুণ শ্রীবৃদ্ধি। ঠিক এই সময়ে সমগ্র ভারতের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। (তখনও মুসলমান এদেশে প্রবেশ করে নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ-রাজগণ-শাসিত সমগ্র হিন্দুস্থান! দক্ষিণভারতে মহাযান-সম্প্রদায়ের মহামহা বৌদ্ধ সুপণ্ডিতের যে আবির্ভাব হইয়াছিল, নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, দিঙ্‌নাগ, ধর্ম্মকীর্ত্তি, ধর্ম্মপাল তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পল্লভ রাজগণের আনুকূল্যে কনজিভারং (কঞ্চিপুর) নামক স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ, কাশ্মীর ও পঞ্জাবে বৌদ্ধদিগের কেন্দ্র ছিল। সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পালবংশীয় রাজগণের সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই বঙ্গদেশের ভিতর গৌড়ে (মালদহে) বিক্রমশিপুরে (বিক্রমপুরে) বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। দীপাঙ্কর প্রভৃতি (অতীশ) বেহারে অবস্থিত বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কত্বে একাদশ শতাব্দীতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেশ বিদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। উহাই তাঁহার তিব্বতে আহূত হইবার কারণ। তাঁহার সমসাময়িক ব্রাহ্মণ জেতারি, যিনি ন্যায়ে অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনিও গৌড়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি পালবংশীয় রাজা কর্ত্তৃক বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষকপদে নিয়োজিত হন। এ পদ সে সময়ে বিশেষ সম্মান ও গৌরব সূচনা করিত।

বেহারের ভাগলপুর জেলায় নলান্দায় (বারগাঁও, চৌকী বিহার) এবং বিক্রমশীলায় (গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী সুলতানগঞ্জের নিকট) দুইটি সুবিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নলান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সুবৃহৎ আশ্রম (বিহার) সংযুক্ত ছিল এবং দশ সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং অষ্টাদশ বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ বৌদ্ধগণ এইখানে থাকিয়া ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও যোগ শাস্ত্র শিক্ষা করিত। বিহার হইতেই বেহার নামের উৎপত্তি। প্রকৃত পক্ষে এই বেহার প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রচার পরিলক্ষিত হয়। চীনদেশীয় পরিব্রাজক সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে, বহুল স্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কচ্ছ, মালুয়া, বোম্বাই-এর উত্তর-পশ্চিমবিভাগের বল্লভি রাজগণও বৌদ্ধ ছিলেন; কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি বেহারের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-গুরুর নিকট তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি যে কেবল ঐ ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি বৌদ্ধগণকে বিনষ্ট ও নির্ব্বাসিত করিবার জন্য দক্ষিণ ভারতের জনৈক রাজাকে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। ক্রমে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। তিনি কুমারিলের শিষ্য। মালাবারে তাঁহার জন্ম। ক্রমে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতে কনজিভারং নামক স্থানে বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে রামানন্দ ও কবীরের আবির্ভাব হইল। মিথিলায় উদয়নাচার্য্য উঠিলেন। কিছু কাল পরে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈতন্যের অভ্যুদয় হইল। এদিকে

যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইতে আরম্ভ হইল; তাহার অব্যবহিত পরেই মুসলমানেরা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ জুড়িয়া দিল। ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খিলিজি বিক্রমশীলা বিনষ্ট করিলেন। বৌদ্ধ-বিহার চূর্ণিত ও বিচূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার স্থানে মস্জেদ বিনির্ম্মিত হইল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করিল। অধুনাতন বঙ্গদেশ-প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার-ব্যবহার-পদ্ধতি এই সময় হইতে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। চৈতন্যের নায়কত্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম, রঘুনন্দনের নির্দ্দেশে (শ্রুতি ?) স্মৃতি, রঘুনাথ শিরোমণির প্রদর্শিত ন্যায়, কৃষ্ণানন্দের প্রচারিত তন্ত্র এদেশে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ করিল। বলিতে কি, ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এদেশে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সে আজ ৩০০।৩১০ বৎসরের কথা। বৌদ্ধধর্ম্ম এক্ষণে এ দেশ হইতে বিলুপ্ত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের লোপ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আবির্ভাবের কারণ কি, অনুসন্ধান করিলেই বলিতে হইবে যে, তাহা আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব। সত্যসত্যই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বিলাসী লোকের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মত সমুন্নত ধর্ম্ম, জীবনে পালন ও হৃদয়ে ধারণ করা বড় কঠিন।

সমগ্র মানব সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। প্রথম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। রাজা অশোকের প্রেরিত বৌদ্ধ-প্রচারকগণের অধ্যবসায় ফলে এই ধর্ম্ম সিংহলে, হিমালয় প্রদেশে ও আফগানিস্থানে প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীর ভিতরে এ ধর্ম্ম সমগ্র চীন-সাম্রাজ্যকে অধিকার করিয়া বসে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধর্ম্ম চীন হইতে জাপানে প্রবেশ করে, এবং এই ধর্ম্মের প্রভাবেই জাপান প্রকৃত সভ্যতাশিখরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে। ফলতঃ অনেক শতাব্দী ধরিয়া জাপানের উপরে ভারতবর্ষের প্রভাব এই বৌদ্ধধর্ম্ম ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। চীন ও জাপানের ন্যায় এই ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে শ্যামদেশে, কাম্বোডিয়ায়, ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টে, বর্ম্মায়, ফরমোজায় ও অন্যান্য বিবিধ স্থানে প্রবেশলাভ করে। হল চেম্বারলেন সাহেব তাঁহার পুস্তকে (Things Japanese) বলেন, জাপানের সমুদয় শিক্ষার ভার অনেক শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধগণের হস্তে ছিল। এই বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়াই জাপানে শিক্ষা—চিকিৎসা-বিদ্যা, কাব্য-সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রবেশাধিকার লাভ করে। এক-কথায়, এই বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার ফলে জাপানজাতি দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। Griff's Japan নামক গ্রন্থে প্রকাশ যে, এই বৌদ্ধধর্ম্মই জাপানী নারীকুলকে সমুন্নত করিয়াছে। বলিতে কি, জাপানী সাহিত্য বৌদ্ধশিক্ষার উপরই প্রতিষ্ঠিত। জাপানের বৌদ্ধ সংস্কারক নিচারণ (Nicheren) দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে জীবিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, 'জাপানের সৌভাগ্য বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে; এই জাপান হইতেই আবার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, এবং এমন এক দিন আসিবে, যখন জাপান হইতে প্রচারক বাহির হইয়া এ ধর্ম্ম আবার ভারতে পুনঃ প্রচার করিবে। যদি কখন জাপান শাক্য-মুনির শিক্ষা ভুলিয়া যায়, তবে জাপানের আবার অধোগতি।'

মহীশূরের উত্তর বিভাগে চিত্তল ড্রুগ (Chittaldroog) নামক পার্ব্বত্য দুর্গে অনেকগুলি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পালি অক্ষরে গৌতমের নাম মিলে। কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তি। কনিংহাম সাহেব বেরাইচ-এর নিকটে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ স্থানে মাটীর ভিতর হইতে অনেকগুলি ভগ্ন অট্টালিকা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উহাতে বৌদ্ধ সময়ের মূর্ত্তি ও মুদ্রা বাহির হইতেছে। পণ্ডিত দয়ারাম, জেতবানের (Jetavana) স্থান অযোধ্যার অন্তর্গত গোণ্ডা জেলায় বাহির করিয়াছেন। ১১২৯ খৃঃ অব্দের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, কনৌজের হিন্দু রাজা গোপালচন্দ্র বৌদ্ধগণকে ছয়টি গ্রাম দান করেন।

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত-বিজয়ে আসিয়া দেখিলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে অশোকের বংশাবলীর উৎসাহে বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান রাউলপিণ্ডীর নিকটে Taxila টাক্শীলার বিশ্ববিদ্যালয়, যাহা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে গ্রীষীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র পৃথিবীস্থ অধিবাসীর প্রতিশতের ভিতরে এখনও প্রায় চল্লিশ জন বৌদ্ধ। এখনও সমগ্র ভারতের বৌদ্ধ-সংখ্যা একলক্ষ সাতষট্টি হাজার। বর্ম্মার নিকটবর্ত্তী বঙ্গদেশে (চট্টগ্রাম) ও হিমালয়ের পাদবর্ত্তী স্থানে তাহাদের অধিকাংশের বাস।

এই বৌদ্ধধর্ম্মকে আবার সজীব করিবার চেষ্টা চলিতেছে। জাপান, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম ও সিংহল, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সচেষ্ট। চীনে Confucianism ও Shintoism কনফিউসিয়ান ও সিণ্টো মত যাহা আছে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম বলা যায় না। গার্হস্থ্য বিধি ও নৈতিক শিক্ষাই তাহার সর্ব্বস্ব। পাশ্চাত্যভূমিতেও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা চলিতেছে। লণ্ডনে পালি ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। আমেরিকা

হইতেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশুদ্ধিমার্গ ইংরাজিতে প্রকাশিত হইতেছে। অষ্ট্রীয়ার অন্তর্গত ভায়না নগরে পালিগ্রন্থ জর্ম্মণ ভাষায় অনুদিত হইতেছে। জর্ম্মাণির লিপজিগ নগরে জর্ম্মাণ ভাষায় অনেকগুলি বৌদ্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। রুসিয়ার সেন্টপিটার্সবর্গে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ গ্রন্থ Biblothica Buddhica নামে প্রকাশিত হইতেছে। ডেনমার্কদেশেও ঐ ভাবের কার্য্য চলিতেছে। হলাণ্ড দেশেও চীনের সাহায্যে বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহিত হইতেছে। বেলজিয়ম প্রদেশে পালি সংস্কৃত ও তিব্বতীয় গ্রন্থ-সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। ফ্রান্সদেশের পারিস নগরের রাজকীয় গ্রন্থালয়ে (Imperial museum), যাবা কাম্বোডিয়া ও মালব প্রদেশ হইতে বিবিধ বৌদ্ধ-গ্রন্থ সংরক্ষিত হইতেছে। অষ্ট্রীয়া ও সুইডেনদেশে ঠিক এইভাবে কার্য্য চলিতেছে। আমেরিকায় প্রবাসী জাপানী বৌদ্ধেরা মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছে, বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে ও বৌদ্ধমত ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেছে। লণ্ডন ও রেঙ্গুনে বৌদ্ধসভা (Budhistic Society) স্থাপিত হইয়াছে। এই ভারতে মহাবোধি-সভা ১৮৯১ সাল হইতে স্থাপনাবধি বিশেষ কার্য্য করিতেছে। বুধগয়া, বেনারস, মাদ্রাজ, ও কলিকাতায় উহার শাখা সভা আছে। প্রধানসভা সিংহলে প্রতিষ্ঠিত।

পালিভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ লিখিত; এই পালিভাষা শিক্ষারও সুব্যবস্থা হইতেছে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পালিভাষার পরীক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

বৌদ্ধ-শাস্ত্রে যে রূপ নীতি-শিক্ষা আছে, অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। আমার বিশ্বাস এই যে ভারতের প্রকৃত সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিবে, যেদিন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।"

নানা কথা।

খনিজ পদার্থ। রত্নগর্ভা ভারতভূমির অসংখ্য খনি হইতে যে সকল দ্রব্য উত্তোলিত হয়, তাহার পরিমাণ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে। নূতন নূতন খনিও আবিষ্কৃত হইতেছে। ভারতে সর্ব্বপ্রথমে ১৮২০ সালে পাথুরিয়া কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়। বিগত ২০ বৎসরের ভিতরে অনেকগুলি খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ১৮৯৬ সালে উত্তোলিত পাথুরিয়া কয়লার পরিমাণ প্রায় ৩৮ লক্ষ টন ছিল; ১৯০৬ সালে উহা ৯৮ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে; স্বর্ণ তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার হইতে পাঁচলক্ষ একাশিহাজার আউন্সে দাঁড়াইয়াছে; কেরোসিন তৈল দেড়কোটী হইতে চৌদ্দ কোটীতে উঠিয়াছে; ম্যাঙ্গনিজ সাতায় হাজার হইতে পাঁচ লক্ষ টনে উঠিয়াছে; অভ্র তের হাজার হইতে প্রায় একান্ন হাজার হন্দরে উঠিয়াছে; (Rubies) বিবিধ মণি মাণিক্য এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার হইতে তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ক্যারেটে উঠিয়াছে। লবণ ষোললক্ষ টন হইতে বারলক্ষ টনে অবনতি পাইয়াছে। Indian World.

অনাথ আশ্রম।—ব্রহ্মে অনাথাশ্রমের আবশ্যক হয় না। গ্রামের অজ্ঞাত লোকেরা অনাথ সন্তান সন্ততিকে নিজ নিজ পুত্র কন্যার ন্যায় লালন-পালন করে। ব্রহ্মদেশে, ধনী ব্যক্তির অন্য কোন উপাধি নাই; তাহাদের মধ্যে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা, বিহার-প্রতিষ্ঠাতা এইরূপ উপাধি পরিদৃষ্ট হয়। Indian World.

গঙ্গাবারি।—E. H. Hankin হানকিন সাহেব গঙ্গা ও যমুনার জল পরীক্ষা করিয়া স্বরচিত The cause and prevention of cholera নামক গ্রন্থে বলেন যে, ঐ দুই নদীর জলে ওলাউঠার কীটাণু বর্দ্ধিত হইতে পারে না। অধিকন্তু ঐ জলে এমন এক anticeptic পদার্থের সন্ধান মিলে, যাহাতে ঐ কীট বিনষ্ট হইয়া যায়। Indian World.

স্ত্রী-যাজক।—The Christian life নামক পত্রে প্রকাশ যে, ইউনাইটেড ষ্টেটে প্রায় তিন সহস্র স্ত্রী-ধর্ম্মযাজক (Women pastor) আছেন।

তুলসী।—হিন্দুজাতির মধ্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ভিতরে তুলসীর সমাদর পরিলক্ষিত হয়, এবং তুলসী দেবোচিত পূজা লাভ করে। তুলসীর অপর নাম Basil plant, or ocynum sanctum. Basil যে শব্দ হইতে উৎপন্ন, গ্রীক ভাষায় তাহার অর্থ kingly অর্থাৎ রাজকীয়। জার্ম্মাণ ও ফ্রাঞ্চ ভাষায় ঐ তুলসী বৃক্ষের অর্থও ঐরূপ। ইটালী ও গ্রীষ দেশে লোকের এরূপ বিশ্বাস যে, তুলসীবৃক্ষে আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত occult শক্তি নিহিত আছে। গ্রীষের অতিপ্রাচীন সময়ে (classical Greece) তুলসীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। St. Basil সেণ্ট বেসিলের দিনে স্ত্রীলোকেরা তুলসীর ক্ষুদ্র শাখা লইয়া গির্জ্জাতে গমন করে। বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া তুলসীপত্র গৃহের ভিতর ছড়ায় এবং দুই চারিটি পত্র ভক্ষণও করে এই বিশ্বাসে যে, সম্বৎসর ধরিয়া গৃহে রোগাদি হইবে না, রেশম বস্ত্রাদিতে পোকা বা ইন্দুরের উৎপাত হইবে না। হিন্দুদিগের পদ্মপুরাণে তুলসীর উৎপত্তির বিবরণ আছে।

Times of India 8th May, 1907.

আগ্নেয়-দ্বীপ।—ভারতবর্ষের আরাকান উপকূলে একটি নূতন দ্বীপ যে উঠিতেছে, Vulcan Island বলিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছে। সাগরগর্ভ হইতে যে যে কারণে দ্বীপ জাগিয়া উঠে, অগ্ন্যুৎপাত তাহার অন্যতম কারণ। এই দ্বীপ আকায়াব হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণে। এই দ্বীপ ১৯০৭।৩০এ ডিসেম্বর তারিখে "Investigator" নামক জাহাজের আরোহী কর্ত্তৃক প্রথম পরিলক্ষিত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য চারিশত গজ ও প্রস্থ দুইশত গজ মাত্র। এই দ্বীপের সর্ব্বোচ্চভূমি সমুদ্রবারি হইতে বিশ ফুট উচ্চ। আবিষ্কৃত হইবার পরেও ইহার মৃত্তিকা উষ্ণ ছিল, এবং কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা নরম অবস্থায় ছিল। সর্ব্বোচ্চস্থানের তিনফুট ভূমির নিম্নে উষ্ণতার মাত্রা (ফারণহিট) তাপমান যন্ত্রের ১৪৮ ডিগ্রী দেখা গিয়াছিল। এই দ্বীপটি প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরি, ৬৭ ফিট জল ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে। ইহার তলদেশের

বিস্তার লম্বায় একমাইল চৌড়ায় প্রায় অর্দ্ধ মাইল। এই দ্বীপটি কেবলই মৃত্তিকাময় বলিলেই হয়; প্রস্তর ও বালুকার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। The Same paper.

অনুষ্ঠান।—বিগত ২৬এ শ্রাবণ সোমবার আন্দুলনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধ আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মতে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

উৎসব।—বিগত ৯ই আষাঢ় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। স্থানাভাবে গতবারে ইহার উল্লেখ করা হয় নাই।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৭২৸৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭১৭।৶৩
সমষ্টি	...	৩০৯০ ৶৯
ব্যয়	...	৩৫১৷৷ ৯
স্থিত	...	২৭৩৮৸৵০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১৩৮৸৵০

২৭৩৮৸৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২১৭৷৷০

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী হইতে পারিবারিক দান

১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১ খণ্ড হাফ গিনি

৭৷৷০

২১৭৷৷০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২।৶০
পুস্তকালয়	...	৩৸ ৬
যন্ত্রালয়	...	১৩৪৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৫।০
সমষ্টি	...	৩৭২৸৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯৭।৴০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৪৸৶৯
পুস্তকালয়	...	৶০
যন্ত্রালয়	...	৯২৸ ৩
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	২৬৸৯
সমষ্টি	...	৩৫১৸ ৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	...	কলিকাতা	৫৲
শ্রীমতী নীপময়ী দেবী	...	"	২৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	...	"	২৲
শ্রীমতী লীলাবতী দেবী	...	"	১৲
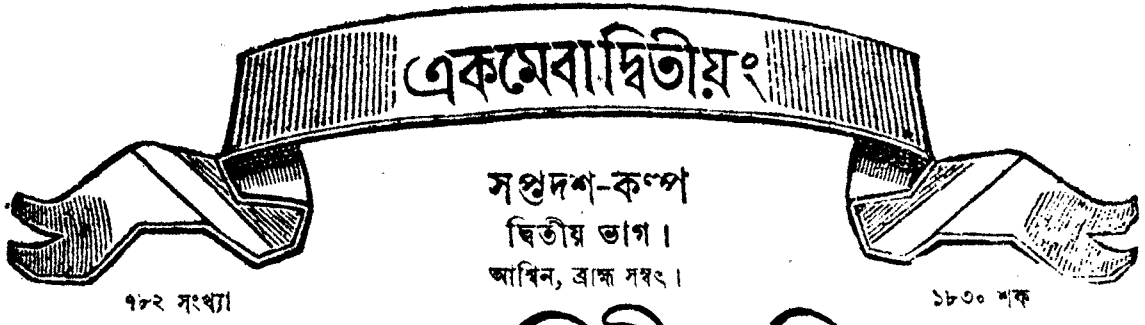
"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत् तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

মঙ্গলগ্রহ।

মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া জ্যোতিষিগণ ইহাকে অনেকদিন হইতে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে গ্রহটির গতিবিধি ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। গত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, জ্যোতিষিগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। নানা দেশের শত শত জ্যোতিষী দূরবীক্ষণ সাহায্যে মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার পর সে প্রকার সুযোগ বহুকাল পাওয়া যায় নাই। আজ কয়েক মাস হইল, আবার সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। দেশ বিদেশের জ্যোতিষিগণ সেই দুর্লভ সময়ে বড় বড় দূরবীক্ষণ দ্বারা আবার নূতন করিয়া মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে যে সকল যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল, এই ১৬ বৎসরে তাহাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে; সুতরাং এই সকল উন্নত যন্ত্রাদি সাহায্যে যে পর্য্যবেক্ষণ হইয়াছে, তাহাদ্বারা মঙ্গললোকের অনেক নূতন খবর পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, প্রত্যেক গ্রহ এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ছোট-বড় সকল গ্রহই সূর্য্যকে মাঝে রাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রহগণের ভ্রমণপথ ঠিক বৃত্তাকার নয়। এককেন্দ্র (Concentric) বৃত্তদ্বয়ের পরিধির মধ্যেকার ব্যবধান যেমন অপরিবর্ত্তিত থাকে, পথগুলি বৃত্তাকার হইলে প্রত্যেক দুই গ্রহের ভ্রমণপথের মধ্যেকার ব্যবধানকেও ঠিক সেই প্রকার অপরিবর্ত্তিত দেখা যাইত। গ্রহমাত্রেই এক একটি বৃত্তাভাস, অর্থাৎ ডিম্বাকার (Elliptical) পথ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এবং সূর্য্য সেই বৃত্তাভাস ক্ষেত্রেরই একটি অধিশ্রয় (Focus) অবলম্বন করিয়া স্থির থাকে। কাজেই পরিভ্রমণ পথগুলির পরস্পর ব্যবধান কখনই এক দেখা যায় না। মঙ্গলের তুলনায় পৃথিবী সূর্য্যের নিকটতর। এজন্য পৃথিবী

যে বৃত্তাভাসপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা মঙ্গলের পথের ভিতরে থাকিয়া যায়। তা'ছাড়া পথ দুইটির অবস্থান এরূপ বিচিত্র যে, যখন মঙ্গল সূর্য্যের নিকটতম স্থান অধিকার করে, তখন পৃথিবী সূর্য্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকে।

পৃথিবীর ভ্রমণপথ মঙ্গলের ভ্রমণপথের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায়, মঙ্গলের পথের তুলনায় পৃথিবীর পথ কিছু ছোট হইয়া পড়িয়াছে, এবং তা'র উপর আবার পৃথিবীর পরিভ্রমণ-বেগ মঙ্গলের বেগের তুলনায় কিঞ্চিৎ দ্রুততর। এই সকল কারণে পৃথিবী যে সময়ে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, মঙ্গলের পূর্ণ প্রদক্ষিণ সে সময়ে শেষ হয় না। কাজেই নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা সাক্ষাৎ করা প্রতি বৎসর ইহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মঙ্গল ও পৃথিবী তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রায় দুই বৎসরে এক একবার পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়ায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী ও মঙ্গলের ভ্রমণপথের ব্যবধান সকলস্থানে সমান ন[illegible], সুতরাং উভয়ের মিলনকালে ব্যবধানটা যদি খুব ছোট না হয়, তবে পর্য্যবেক্ষণের অত্যন্ত অসুবিধা আসিয়া পড়ে। গ্রহদ্বয়ের ভ্রমণপথের যে দুইটি স্থানের দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, ১৮৯২ সালে এবং গত বৎসরে মঙ্গল ও পৃথিবী সেইস্থানে আসিয়া মিলিয়াছিল। [illegible]র্য্যবেক্ষণগণ এই দুই বৎসরে মঙ্গ[illegible] অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ[illegible] পাইয়াছিলেন।

[illegible]লে অবস্থিত, পৃথিবী তা[illegible] হইয়া দাঁড়াইয়া চলা[illegible] করে না; ইহার অক্ষরেখা (Axis) সেই সমতলের [illegible] প্রায় ২৩ অংশ পরিমিত কোণ করিয়া হেলিয়া রহিয়াছে। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, অক্ষরেখার এই বক্রতাই ভূপৃষ্ঠে শীতগ্রীষ্মাদি নানা ঋতুকে ডাকিয়া আনে। মঙ্গল পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহার অক্ষরেখা পরীক্ষা করিয়া, তাহাতেও ঠিক ঐ পরিমাণ বক্রতা দেখা গিয়াছে, এবং মাঙ্গলিক দিন ও পার্থিব দিনের মধ্যেও একতা ধরা পড়িয়াছে। হিসাব করিলে দেখা যায়, মাঙ্গলিক দিন, পার্থিব দিন অপেক্ষা চল্লিশ মিনিটের অধিক দীর্ঘ নয়; সুতরাং শীতগ্রীষ্মাদি নানা ঋতু যে কেবল পৃথিবীতেই বিরাজ করিতেছে, এখন আর সে কথা বলা যায় না। মঙ্গললোকেও ষড়্‌ঋতু নিয়মিতভাবে যাওয়া আসা করে।

পৃথিবীর সহিত মঙ্গলগ্রহের ইহাই একমাত্র ঐক্য নয়। পুনঃপুনঃ মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উভয়ের মধ্যে আরো অনেক একতা দেখা গিয়াছে। মঙ্গলের ব্যাস ৪২০০ মাইল। কাজেই আয়তনে মঙ্গল, পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, এবং গুরুত্বেও অনেক লঘু। হিসাব করিলে দেখা যায়, পৃথিবী তাহার পৃষ্ঠস্থ বস্তুগুলিকে যে বলে টানে, মঙ্গল তাহার পাঁচভাগের দুইভাগ মাত্র বলে টানিতে পারে। এক মণ পঁইত্রিশ সের ওজনের মানুষ পৃথিবী হইতে সহসা মঙ্গললোকে নীত হইলে, সেখানে তাহার ওজন আধমণের অধিক হইবে না; সুতরাং পার্থিব মানব মঙ্গললোকে গিয়া মৃত্তিকা হইতে বহু উর্দ্ধে লাফাইতে পারিবে, এবং তাহার হস্তনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র পৃথিবীর তুলনায় আড়াইগুণ উচ্চে উঠিয়া, ধীরে ধীরে নামিয়া মাটিতে পড়িবে।

গ্রহের লঘুতা তাহার উপরিস্থিত পদার্থগুলিকে লঘু করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। লঘুতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকর্ষণের পরিমাণ কমিয়া আসে বলিয়া, সকল প্রাকৃতিক

ব্যাপারই ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গ্রহাদির গুরুত্বের তুলনায় সূর্য্য ও নক্ষত্র প্রভৃতি বৃহৎ জ্যোতিষ্কগুলির গুরুত্ব অনেক অধিক; সুতরাং ইহাদের আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই শ্রেণীর বড় জ্যোতিষ্কগুলি হাইড্রোজেন ও হেলিয়ম্ প্রভৃতি অতি লঘু বাষ্পগুলিকেও তাহাদের আকাশ হইতে যাইতে দেয় নাই। নক্ষত্রদিগের আকাশ সর্ব্বদাই লঘু-গুরু নানাজাতীয় বাষ্পে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। পৃথিবীর গুরুত্ব মঙ্গলের তুলনায় অধিক হইলেও, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির তুলনায় অতি অল্প। কাজেই পৃথিবী তাহার দুর্ব্বল আকর্ষণে হাইড্রোজেন্ ও হেলিয়ম্ প্রভৃতি লঘু-বাষ্পগুলিকে আকাশে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। এ গুলি বহুকাল পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া মহাকাশে চলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন প্রভৃতি গুরুতর বাষ্পগুলিই আমাদের আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্রের গুরুত্ব ও আয়তনে উভয়ই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক অল্প। এজন্য ইহার আকাশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ন্যায় গুরু বাষ্পকেও চন্দ্র টানিয়া রাখিতে পারে নাই। কাজেই চন্দ্রের দেশে আকাশ একপ্রকার শূন্য হইয়াই রহিয়াছে। চন্দ্রগর্ভ হইতে যে জলীয় ও অঙ্গারক বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই ক্ষণকালের জন্য আকাশে বিচরণ করিয়া ক্রমে চিরকালের জন্য মহাকাশে অন্তহিত হইয়া যায়। মঙ্গলের গুরুত্ব, চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত অল্প নয়; সুতরাং ইহাতে নাইট্রোজেন্ বা অক্সিজেনের ন্যায় গুরু বাষ্প থাকারই সম্ভাবনা অধিক।

মঙ্গলপৃষ্ঠে যে জলীয় বাষ্প আছে, গত ১৮৯২ সাল এবং তৎপূর্ব্বকার পর্য্যবেক্ষণে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মেরুসন্নিহিত প্রদেশ যেমন শীতকালে বরফে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, মঙ্গলগ্রহে শীতকাল উপস্থিত হইলে, তাহার মেরুপ্রদেশকেও ঠিক সেই প্রকারে তুষারাচ্ছন্ন হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীরই মত সেই মাঙ্গলিক তুষাররাশি গলিয়া মেরুপ্রদেশের শুভ্রতা নষ্ট করিয়া ফেলে।

মেরুপ্রদেশের পূর্ব্বোক্ত শুভ্র মুকুটকে কয়েকজন পণ্ডিত কঠিন অঙ্গারক বাষ্প বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। আমেরিকার লিক্ মানমন্দিরের প্রধান-জ্যোতিষী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত পিকারিঙ্ সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন,—যতই শীতল করা যাউক না কেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের অন্ততঃ পাঁচগুণ চাপ না পাইলে অঙ্গারক বাষ্প জমাট বাঁধিতে পারে না; কিন্তু মঙ্গলের আকাশের চাপ ভূ-বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক কম; সুতরাং জলীয় বাষ্পই যে জমাট বাঁধিয়া মঙ্গলে শ্বেতমুকুটের রচনা করে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই; কিন্তু পৃথিবীর মত মঙ্গলে প্রচুর জল নাই, এবং মাঙ্গলিক সমুদ্রগুলিও পৃথিবীর সমুদ্রের ন্যায় গভীর নয়। পৃথিবীর জলাভূমিগুলি যেমন অগভীর, মাঙ্গলিক সমুদ্রগুলিও প্রায় তদ্রূপ। শীতের পর বসন্ত উপস্থিত হইলে মেরুপ্রদেশের তুষাররাশি গলিয়া এই নিম্ন ভূমিগুলিকে জলপ্লাবিত করে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলের তুলনায় পৃথিবীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, কাজেই ইহার আকর্ষণের পরিমাণও মঙ্গল অপেক্ষা অনেক অধিক। এই আকর্ষণে পৃথিবী খুব লঘু বাষ্পগুলিকে টানিয়া রাখিতে পারে নাই বটে; কিন্তু জলীয়

বাষ্পকে সে সহজে ছাড়িতেছে না। এই কারণে ইহা নানা আকার পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা ভূপৃষ্ঠে ও আকাশে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু মঙ্গল তাহার দুর্ব্বল টানে জলীয় বাষ্পকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। কাজেই এই বাষ্পগুলি ধীরে ধীরে গ্রহত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। পিকারিঙ্ সাহেব বলিতেছেন, গ্রহের গর্ভ হইতে যে সকল জলীয়বাষ্প সদ্য উত্থিত হইতেছে, তাহা জমিয়াই মেরুপ্রদেশের তুষারাবরণ উৎপন্ন করে, এবং বসন্তাগমে গলিয়া জল ও বাষ্পাদির আকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সমস্তই গ্রহত্যাগ করিয়া চলি যায়; সুতরাং দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান অবস্থায় মঙ্গলে জল থাকিলেও, যখন গর্ভস্থ জলভাণ্ডার সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া যাইবে, তখন আর একবিন্দু জলও মঙ্গলপৃষ্ঠে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ ত্রিশ ইঞ্চি উচ্চ পারদের ভারকে অনায়াসে উপরে উঠাইয়া রাখিতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মঙ্গলের আকাশের চাপ সাত ইঞ্চির অধিক উচ্চ পারদকে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষ কত তরল বায়ুর মধ্যে থাকিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, বায়ুকে তরল করিতে করিতে যখন তাহার চাপ পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ পারদের ভারের অনুরূপ হয়, তখন সেই বায়ুদ্বারা আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলে না। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় সাত ইঞ্চি পারদের ভারের তুল্য; সুতরাং এই বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস করিয়া, এবং গ্রহপৃষ্ঠস্থ জল ব্যবহার করিয়া, কোন জীবের প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব নয়; কিন্তু এইপ্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া ঠিক আমাদিগের মত বুদ্ধিমান্ প্রাণী মঙ্গলগ্রহে জন্মিতে পারিয়াছে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।

দূরবীক্ষণসাহায্যে মঙ্গল পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহার উপরে কতকগুলি সুবিন্যস্ত রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে লইয়া আজ কয়েক বৎসর জ্যোতির্বিদ্গণের মধ্যে খুব আলোচনা চলিতেছে। একদল জ্যোতিষী বলিতেছেন, এই রেখাগুলি মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ বড় বড় খাল ব্যতীত আর কিছুই নয়। বরফগলা জলকে মেরুপ্রদেশ হইতে দূরদেশে লইয়া আসিবার জন্য মাঙ্গলিক প্রাণিগণ এই খালগুলিকে কাটিয়া রাখিয়াছে। ইঁহারা কোনক্রমে এগুলিকে স্বাভাবিক খাল বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। দূরবীক্ষণে এগুলি যে প্রকার সরল ও সুবিন্যস্ত দেখা যায়, কোন নদ নদীরই স্বাভাবিক অবস্থান সেপ্রকার দেখা যায় না। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা বলিতেছেন, মানুষ অপেক্ষা সহস্রগুণে বুদ্ধিমান্ কোন প্রাণী নিশ্চয়ই মঙ্গলে বাস করিতেছে, এবং ইহারাই বুদ্ধিকৌশলে ঐসকল বৃহৎ খাল খনন করিয়া গ্রহের সর্ব্বাংশে জল যোগাইতেছে। মঙ্গলগোলকস্থ কৃষ্ণরেখাগুলি যে সত্যই জলপ্রণালী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মেরুপ্রদেশের বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে, ঐ রেখাগুলিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বলেন,—বরফের জলে খালগুলি পূর্ণ হইলে, তাহার উভয় তীরের সিক্ত মৃত্তিকায় যে সকল উদ্ভিদ্ জন্মায়, তাহাই খালগুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেয়।

আর একদল পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, মাঙ্গলিক খালের ন্যায় সুবিন্যস্ত ছোট ছোট খাল

চন্দ্রমণ্ডলেরও স্থানে স্থানে দেখা যায়। চন্দ্র যে সম্পূর্ণ নির্জীব, তাহাতে আর এখন মতদ্বৈধ নাই; সুতরাং যে প্রাকৃতিক শক্তিতে চন্দ্রে খালের উৎপত্তি হইয়াছে, মঙ্গলের খালগুলি সেই শক্তিদ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা অযৌক্তিক নয়। তা'ছাড়া মঙ্গলের যে সকল অংশকে জ্যোতিষিগণ সমুদ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অনেক খালকে সেই সকল সমুদ্রের উপরেই অবস্থিত দেখা যায়; সুতরাং জল-চালনাই যদি খাল-খননের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐসকল খালের কোনই সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে মাঙ্গলিক জীব সমুদ্রগর্ভে খাল খনন করিতে পারে, তাহাকে কখনই সুবুদ্ধি প্রাণী বলা যাইতে পারে না।

মঙ্গলগ্রহ, বুদ্ধিমান্ প্রাণীদ্বারা অধ্যুষিত কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া যে তর্ককোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আজও নিবৃত্তি হয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্‌মাত্রেই কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রশ্নটির মীমাংসা-চেষ্টায় যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে মঙ্গলসম্বন্ধে অনেক নূতন সংবাদ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু তথাপি এখনো এসম্বন্ধে অনেক জানিতে বাকি। এগুলি নিশ্চিতরূপে আবিষ্কৃত না হইলে, মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইবে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সিয়াপারেলি (Schiaparelly) সাহেব বহুপূর্ব্বে মঙ্গলে যে সকল রেখা দেখিতে পাইয়াছিলেন, গত ১৮৯২ সালের পর্য্যবেক্ষণে সেগুলিকে দেখা যায় নাই; কিন্তু ১৯০৩ সালের পর্য্যবেক্ষণে সেগুলি আবার যথাস্থানে আবির্ভূত হইয়াছিল। মঙ্গলগ্রহের এইপ্রকার অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যানই এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আজ কয়েকমাস হইল মঙ্গলগ্রহ আবার একবার পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া আত্মপরিচয় প্রদানের সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে। দেশবিদেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং আশা করা যাইতে পারে, এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির এক অতিক্ষুদ্র অংশ হইতে রহস্য-যবনিকা উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশ্বনাথের সৃষ্টিমহিমাকে আরো প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইব।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

দ্বিতীয়-উপদেশের অনুবৃত্তি।

স্বার্থনীতিবাদের আর একটি পরিণাম এইখানে নির্দ্দেশ করিব।

কোন স্বাধীন জীব,—যে, ন্যায়ের নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে, যে জানে,—সে-নিয়ম সে পালন করিতেও পারে, লঙ্ঘন করিতেও পারে—এইরূপ জানিয়া-বুঝিয়াও সে যদি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে ইহাও জানে যে, ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিবার জন্য সে দণ্ডনীয়। দণ্ডের ধারণা একটা কৃত্রিম ধারণা নহে; ব্যবস্থাপকদিগের গভীর ফলাফল-গণনা হইতে উহা ধার-করিয়া পাওয়া নহে; বরং ব্যবস্থাপকেরা দণ্ডের স্বাভাবিক ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই দণ্ডাদি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। স্বাধীনতা ও ন্যায়ের সঙ্গেই এই ধারণার ঘনিষ্ঠ যোগ; সুতরাং যেখানে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের অসদ্‌ভাব, সেখানে দণ্ডসম্বন্ধীয়

ধারণারও অসদ্ভাব। যে ব্যক্তি সুখের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, শুধু স্বার্থের প্ররোচনায় অনর্থকরী কোন বাসনার বশবর্ত্তী হয়, অথচ যদি সেই সঙ্গে অন্ততঃ ন্যায়ের বাহ্য নিয়ম সে রক্ষা করিয়া চলে, তাহা হইলে, তাহার ঐরূপ কাজকে কি প্রশংসা করা যাইতে পারে?—কখনই না। ঐ কাজকে তাহার অন্তরাত্মা কখনই ভাল বলিবে না; সেই কাজের জন্য সে কাহারও ধন্যবাদের পাত্র হইবে না, পুরস্কারের পাত্রও হইবে না;—কেন না,ঐ কাজ করিবার সময় সে শুধু আপনার কথাই ভাবিয়াছিল। তা'ছাড়া, আত্মসেবা করিতে গিয়া সে যদি পরের অনিষ্টকরিয়া থাকে, এবং তজ্জন্য সে যদি আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে না করে, তাহা হইলে সে যে দণ্ডার্হ, একথা সে নিজেও বলিতে পারে না—অন্য কেহও বলিতে পারে না। কোন স্বাধীন জীব,—যে আপনার ইচ্ছা-অনুসারে কাজ করে, যে একটা নিয়মের অধীন,—যে নিয়ম সে পালন করিতেও পারে, লঙ্ঘন করিতেও পারে,—সেই জীবই শুধু আপনার কাজের জন্য দায়ী; কিন্তু এই স্বাধীনতা ও ন্যায়-বোধের অসদ্ভাবে, তাহার দায়িত্ব কোথায়? যেমন কোন পাথর মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকেই নীত হয়, যেমন চুম্বক-শলাকা উত্তরাভিমুখেই মুখ ফিরাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক, স্বার্থের নিয়মে, শুধু আত্মসুখের দিকেই ধাবিত হয়। স্বার্থের অনুসরণে, মানুষ যখন বিপথগামী হয়, তখন উপায় কি? তখন অবশ্য তাহাকে ভাল পথে ফিরাইয়া আনা আবশ্যক। কিন্তু তখন আর কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া, তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি দেওয়া হয় কেন?—না, সে ভুল করিয়াছে বলিয়া; কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি সুপরামর্শেরই পাত্র—দণ্ডের পাত্র নহে। স্বার্থতন্ত্রানুসারে, দণ্ড-পুরস্কার ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; ব্যক্তিগত হিসাবে সমাজের আত্মরক্ষণই দণ্ডের উদ্দেশ্য; একটা হিতকর ভীতি উৎপাদন করিবার জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যটি ভাল—যদি উহাতে কেবল এই কথাটি যোগ করিয়া দেওয়া হয় যে, এই দণ্ড স্বরূপতঃ ন্যায্য, এই দণ্ড অপরাধেরই ন্যায্য ফল, কোন একটা অপকর্ম্ম করাতেই এই দণ্ড বৈধরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কথাটি উঠাইয়া লইলে, অন্যান্য উদ্দেশ্যের প্রামাণ্য বিনষ্ট হয়; তখন উহা নীতি-বিরহিত হইয়া কেবল পাশব বলেতেই পর্য্যবসিত হয়। তখন আর অপরাধীকে অপরাধী-মনুষ্যের ন্যায় দণ্ড দেওয়া হয় না; যে সকল পশু আমাদের কোন কাজে না আসিয়া আমাদের অনিষ্ট করে, তখন সেই সকল পশুর ন্যায় তাহাকে আঘাত, কিংবা হত্যা করা হয়। তখন সেই অপরাধী, ন্যায়-দণ্ডের নিকট আপনা হইতেই নত-শির হয় না—নতশির হয়, কেবল লৌহ বেড়ীর ভারে, কিংবা খড়্গের আঘাতে। সে দণ্ডের কোন বৈধ সার্থকতা নাই, সে দণ্ড অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নহে;—ইহা সেরূপ দণ্ড নহে, যাহাকে অপরাধী দণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারে,—বুঝিতে পারে যে, এই দণ্ড নিয়মলঙ্ঘনেরই উচিত ফল। তাহার নিকট এই দণ্ড, অনিবার্য্য প্রচণ্ড ঝটিকার মত;—এই দণ্ড বজ্রের মত তাহার মাথার উপর আসিয়া পড়ে; তাহার শক্তি অপেক্ষা এই শক্তি অধিক প্রবল বলিয়াই সে তাহার আঘাতে ধরাশায়ী হয়। রাজ-দণ্ডের প্রকাশ্য আড়ম্বর অবশ্য লোকের কল্পনার উপর কাজ করে; কিন্তু উহা লো-

ক্রের জ্ঞানকে উদ্বোধিত করে না, কিংবা লোকের বিবেক-বুদ্ধি হইতে সায় পায় না। ঐরূপ দণ্ড উহ'দিগকে ভীত করিয়া তোলে;—কিন্তু প্রশান্ত করিতে পারে না। স্বার্থনীতির পুরস্কারও কেবল একটা আকর্ষণ—কেবল একটা প্রলোভন মাত্র। এই পুরস্কারের মধ্যে কোন ধর্ম্মনীতির ভাব নাই—আপনার সুবিধা হইবে বলিয়াই লোকে এইরূপ পুরস্কারের প্রার্থী হয়। এইরূপে, ধর্ম্মের ফল সুখ, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুঃখ—এই যে দণ্ড-পুরস্কারের পারমার্থিক ও লৌকিক ভিত্তি, এই মহতী ভিত্তিটি বিনষ্ট হয়।

অতএব, আমরা নির্ভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিঃ—স্বার্থবাদ, প্রত্যক্ষ-তথ্য-সমূহের বিরোধী, বিশ্বমানবের যাহা ধ্রুব-বিশ্বাস—সেই সকল ধ্রুব-বিশ্বাসের বিরোধী। ইহলোক অপেক্ষা পরলোকে ন্যায়ের নিয়ম অধিকতর বাস্তবতায় পরিণত হইবে—এই যে পারলৌকিক আশা, ইহার সহিতও স্বার্থবাদের মিল হয় না।

বিশ্বজগতের ও বিশ্বমানবের একজন স্রষ্টা অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর আছেন,—ঐন্দ্রিয়িক দর্শন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে কি না,সে বিষয়ের অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। আমাদের ধ্রুব-বিশ্বাস, ঐন্দ্রিয়িক দর্শন ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; কেন না, ইন্দ্রিয়-বোধ, মানব-মনের যে সকল বৃত্তির ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ, সেই সব বৃত্তি হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়; তাহার দৃষ্টান্ত,—কারণের সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব,—যাহার অবিদ্যমানে, কোন কিছু-রই কারণ অনুসন্ধানে আমরা প্রয়োজন অনুভব করি না, কিংবা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হই না। আমরা এক্ষণে শুধু এই কথা প্রতিপাদন করিতে চাই যে, মানুষের যদি বাস্তবিকই কোন নৈতিক গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই সকল গুণ ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করায় মানুষের কোন অধিকার থাকে না; কেন না, মানুষ, সেই সকল গুণের কোন চিহ্ন জগতের মধ্যে দেখিতে পায় না—আপনার মধ্যেও দেখিতে পায় না। স্বার্থনীতির ঈশ্বর, ঐ স্বার্থনীতি-পরায়ণ মানুষের অনুরূপই হইবে। কেমন করিয়া তুমি ঈশ্বরকে ন্যায়বান্ ও প্রেমময় বলিবে—(এই প্রেম নিঃস্বার্থ প্রেম বলিয়াই বুঝিতে হইবে) যখন স্বার্থনীতি, এইরূপ ন্যায় ও প্রেমের কোন ধারণাই করিতে পারে না। যে ঈশ্বর আপনাকেই ভাল বাসেন, আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভাল বাসেন না—স্বার্থনীতি শুধু এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে পারে। আমরা যদি ঈশ্বরকে দয়া ও ন্যায়ের মূলাধার বলিয়া না ভাবি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিতেও পারি না, ভক্তি করিতেও পারি না। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা আমাদের মনে যে ভয়ের উদ্রেক করে, আমরা শুধু সেই ভয়ের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া তাঁ-হাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই;—এ পূজা প্রীতি, কিংবা ভক্তির পূজা নহে—ইহা ভয়-মূলক পূজা।

এইরূপ, ঈশ্বরের উপর আমরা কি কোন পবিত্র আশা স্থাপন করিতে পারি? আমরা যদি কেবল হীন সুখেরই অন্বেষণ করি, কেবল স্বার্থসাধনেই ব্যাপৃত থাকি, আমরা যদি ন্যায়কে সমর্থন কারবার জন্য কখন কষ্টস্বীকার করিয়া না থাকি, আমাদের আত্মার মহত্ত্বরক্ষা ও পরি-পুষ্টি করিবার জন্য কোন চেষ্টা করিয়া না থাকি, তাহা হইলে জগৎ-পিতার দয়ামিশ্র

ন্যায়ের ভাব আমরা কি করিয়া মনে ধারণা করিব? যে নিয়মটি হইতে, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যেরা, আত্মার-অমরত্বের বিশ্বাসে উপনীত হয়েন—সে নিয়মটিও অপরিহার্য্য পাপ-পুণ্যের নিয়ম। এই ন্যায়ের নিয়মটি এ লোকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় না বলিয়াই আমরা ঈশ্বরের দোহাই দিই; আমরা মনে করি, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে ন্যায়ের নিয়ম স্থাপন করিয়া, আমাদের সম্বন্ধে এই নিয়মটি কি তিনি নিজেই লঙ্ঘন করিবেন? আমরা দেখাইয়াছি, স্বার্থনীতি—কি ইহলোকসম্বন্ধে, কি পরলোকসম্বন্ধে—এই পাপ-পুণ্যের নিয়মটিকে ধ্বংস করিয়াছে। এই পৃথিবীর পরপারে স্বার্থনীতির দৃষ্টি মোটেই চলে না। অসম্পূর্ণ স্বার্থনীতি, অসম্পূর্ণ মানব-বিচারের বিরুদ্ধে, অদৃষ্টের যদৃচ্ছ অত্যাচারের বিরুদ্ধে,—সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণন্যায় পূর্ণমঙ্গল বিচারকের নিকট পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করে না। স্বার্থনীতির মতে,—অন্তঃকরণের স্বাভাবিক সংস্কার যাহাই হউক না কেন, অন্তরাত্মার মধ্যে ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস যাহাই অনুভূত হউক না কেন, এমন কি, প্রজ্ঞার মূল নিয়ম যাহাই হউক না কেন, জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানুষের যাহা কিছু ঘটে, তাহাই মানুষের সব—তাহাতেই মানুষের সমস্ত কাজের পরিসমাপ্তি হয়।

যে সকল ভয় ও আশা, প্রকৃত স্বার্থ হইতে মানুষকে বিমুখ করে, সেই সকল ভয় ও আশা হইতে মানুষকে বিযুক্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া Helvetios-এর শিষ্যগণ হয় ত গৌরব অনুভব করিবেন। মানবজাতি অবশ্য তাঁহাদের এই কাজের মূল্য ও মর্য্যাদার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের সমস্ত অদৃষ্টকে এই পৃথিবীর মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এমন কি সৌভাগ্য তাঁহারা আমাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা সকলেরই ঈর্ষ্যার যোগ্য?—আমাদের সুখের জন্য তাঁহারা কিরূপ সামাজিক ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন? তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি হইতে কিরূপ রাষ্ট্র-নীতি প্রসূত হইয়াছে?

ইহার যা' উত্তর, তাহা তোমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছ। আমরা দেখাইয়াছি,—ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র, প্রকৃত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকারকে স্বীকার করে না। এই দর্শনতন্ত্রের নিকট ইচ্ছাশক্তি আসলে কি?—না, মনের বাসনা চরিতার্থ করিবার শক্তি। এই হিসাবে, মানুষ স্বাধীন নহে, এবং অধিকার, বলেরই নামান্তর মাত্র।

আমরা বলি;—স্বার্থনীতির মতে, বাসনা ছাড়া মানুষের নিজস্ব কিছুই নাই। অভাব-বোধ হইতেই বাসনার উৎপত্তি;—মানুষ এই অভাব-বোধের কর্ত্তা নহে—ভোক্তা। ইচ্ছাকে বাসনায় পরিণত করাও যা', স্বাধীনতার বিনাশ সাধন করাও তা'; তা' অপেক্ষা আরও বেশী—ইহাতে করিয়া বাসনাকে এমন একটা আসনে বসানো হয়, যে আসনটি বাসনার নিজস্ব নহে; উহাতে করিয়া একটা মিথ্যা স্বাধীনতার সৃষ্টি করা হয়, ও সেই স্বাধীনতা, কেবল বদ্‌মাইসি ও দৈন্যাবস্থার একটা অস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিলে, কত কত বাসনা মনে উদয় হয়, যাহা পূর্ণ করা অসম্ভব। বাসনা স্বভাবতই অসীম, অথচ আমাদের শক্তি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে আমরা যদি একা থাকিতাম, তা' হইলেও আমাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিতে কত কষ্ট পাইতে হইত। এখন ত অন্যের সহিত আমাদের

ভীষণ সংঘর্ষ;—অসংখ্য লোকের অসংখ্য বাসনা, এবং তাহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, বিচিত্র, ও অসমান। যখনই আমাদের ব্যক্তিগত বল—ব্যক্তিগত অধিকার হইয়া দাঁড়ায়, তখনই অধিকারসাম্য অসম্ভব আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়; সকলেরই অধিকার অসমান,—সকলের শক্তিসামর্থ্য অসমান, এবং এই অসমতা কস্মিন্ কালেও ঘুচিবার নহে; সুতরাং স্বাধীনতার ন্যায় সাম্যকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়; যদি মিথ্যা স্বাধীনতার ন্যায় একটা মিথ্যা সাম্যের সৃষ্টি করা হয়, সে শুধু একটা মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ মাত্র।

এই স্বার্থনীতি, এই সকল সামাজিক উপকরণকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলে। আমি স্পর্দ্ধার সহিত জিজ্ঞাসা করি, স্বার্থনীতি-সম্প্রদায় ও ইন্দ্রিয়বাদ-সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা এই সকল উপকরণ হইতে এক দিনের জন্যও কি মানবজাতির সুখ ও স্বাধীনতার ব্যবস্থা করিতে পারেন?

যেহেতু বলই অধিকার—অতএব, মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহই স্বাভাবিক অবস্থা। একই জিনিস সকলেই চাহে; সুতরাং তাহারা সকলেই পরস্পরের শত্রু; যাহারা দুর্ব্বল,—শারীরিক বিষয়ে দুর্ব্বল, মানসিক বিষয়ে দুর্ব্বল—এই যুদ্ধে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্—তাহারাই পূর্ণ অধিকারের অধিকারী। যেহেতু বলই অধিকার,—প্রকৃতি সবল করিয়া সৃষ্টি করে নাই বলিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রকৃতির নিকটেই নালিস করিতে পারে; কিন্তু যে বলবান্ ব্যক্তি বল-প্রয়োগ করিয়া তাহাকে উৎপীড়ন করে, তাহার নিকটে সে কখনই নালিস করিতে পারে না। দুর্ব্বল ব্যক্তি তখন ফিকির-ফন্দির সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; তখনই ছলের সহিত বলের যুঝাযুঝি আরম্ভ হয়।

যদি মানুষের মধ্যে,—প্রয়োজন, বাসনা, প্রবৃত্তি, স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তবে রক্তপ্লাবী যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী; কোন প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না; যুদ্ধবিগ্রহকে কিছুকালের জন্য চাপা দিয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু আইন-কানুন যতই চাপিবার চেষ্টা করুক না কেন, আইন-কানুনের অবগুণ্ঠন ছিঁড়িয়া উহা এক-একবার বাহির হইবেই হইবে। যাহারা আসলে স্বাধীন নহে, তাহাদের জন্য স্বাধীনতার কল্পনা করা,—যাহারা আসলে বিভিন্ন, তাহাদের মধ্যে সমতার কল্পনা করা,—যাহাদের মধ্যে অধিকারবুদ্ধি নাই, তাহাদের নিকটে অধিকারের সম্মাননা প্রত্যাশা করা, এবং অবিনশ্বর দুষ্প্রবৃত্তির উপর—অন্তরের রিপুসমূহের উপর—ন্যায়কে স্থাপন করা কি বিষম মূঢ়তা! এই বিষম চক্র হইতে বাহির হওয়া কি কষ্টকর ব্যাপার!

এই সাংঘাতিক চক্র হইতে বাহির হইতে হইলে, এমন কতকগুলি মূল সূত্রের আশ্রয় লইতে হয়, যাহা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-বাদ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না—ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র যাহার কোন ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না, অথচ যাহা মানুষের অন্তরেই নিহিত আছে। য়ুরোপে এই সকল নীতি-সূত্র, খৃষ্টধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ গৃহীত হইয়া য়ুরোপের আধুনিক সমাজকে পরিচালিত করিতেছে। যে প্রখ্যাত "অধিকার ঘোষণা"-পত্র দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার প্রতিপাদিত করিয়া, চিরতরে অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার স্থানে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে

স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে এই সকল মূল সূত্রের কথাই লিখিত হইয়াছিল, এখনও এই সকল মূলসূত্র, আমাদের শাসনপদ্ধতির মধ্যে, আমাদের বিধিব্যবস্থার মধ্যে, আমাদের বিবিধ স্থায়ী অনুষ্ঠানের মধ্যে, আমাদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে, এমন কি, যে বায়ু আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, সেই বায়ুর মধ্যে অবস্থিত। এই সকল মূলসূত্রই আমাদের সমাজের ভিত্তিভূমি এবং যে দর্শনতন্ত্র আমাদের এই অভিনব সমাজের জন্য আবশ্যক, সেই দর্শনতন্ত্রেরও ভিত্তিভূমি।

আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে অষ্টাদশ শতাব্দির এই সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—এই সকল সাধু-প্রকৃতির লোকেরা, কি করিয়া ঐ ঐন্দ্রিয়িক দর্শনের দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন,—যে দর্শনতন্ত্র তাঁহাদের হৃদ্গত ভাবের বিরোধী? আমি কেবল তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব যে, ঐ যুগ উল্টা-স্রোতের যুগ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সংকীর্ণ ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতা ও তাহার নিত্য সহচর ভণ্ডামির অতিমাত্র প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল। সেই অন্ধ অতিভক্তিই স্বেচ্ছাচারিতাকে ডাকিয়া আনিল; এই স্বেচ্ছাচারিতায় সমস্তই আক্রান্ত হইল। রাজকুল হইতে অভিজাতবর্গের মধ্যে, পাদ্রিদের মধ্যে, লোকসাধারণের মধ্যে উহা ক্রমশঃ সংক্রামিত হইল। ভাল ভাল লোক, এমনকি, দুই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিও ঐ আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িল; আমাদের উন্নত উদার জাতীয় দর্শনের স্থান, একটা হীনতর দর্শন আসিয়া অধিকার করিল;—লকের শিষ্য কঁদিয়াক্, দেকার্ত্তের স্থান অধিকার করিল। সুখের নীতি, স্বার্থের নীতি ঐ যুগে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বিশ্বাস করিও না যে, সেই সময়কার সকল লোকই সুনীতিভ্রষ্ট হইয়াছিল। রইয়ে-কলার বলেন,—মত যতই খারাপ হোক্ না কেন, সেই মতাবলম্বী লোকেরা তত খারাপ নহে। ষ্টোয়িক-মতবাদ যতটা কঠোর, ষ্টোয়িক-মতাবলম্বী লোকেরা ততটা কঠোর নহে; এপিকিউরীয় মতবাদ যতটা চিত্ত-দৌর্ব্বল্যজনক, সেই মতাবলম্বী লোকেরা ততটা দুর্ব্বলচিত্ত নহে। দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত মানুষ, ধর্ম্মের উপদেশ যেমন সম্পূর্ণরূপে কাজে প্রয়োগ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন দূষিত মত মানুষকে অপথে লইয়া গেলেও,—ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার অন্তরাত্মা সেই মতকে মনে মনে ধিকার করে। এই কারণে, অষ্টাদশ শতাব্দিতে, সুনীতিধ্বংসী ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র ও স্বার্থনীতির প্রাচুর্ভাব হইলেও, খুব উদার নিঃস্বার্থ ভাবেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কখন-কখন দেখা যায়।

আমার এই উপদেশটি একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবে; তোমাদের মনে যে সব তত্ত্ব আমি দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিতে চাই, তাহার সহিত স্বার্থনীতির ঐক্য হয় না বলিয়াই এত কথা আমার বলিতে হইল। এই স্বার্থনীতি যে একটা মিথ্যা উদার ভাবের ভাণ করে, সেই ভাণটা আমার ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। আমার মতে, এই নীতি দাসদিগের নীতি; এ নীতি এই স্বাধীনতা-যুগের নীতি নহে। স্বার্থনীতিবাদকে খণ্ডন করিলাম; এক্ষণে, আর যে সকল নীতিবাদ,—সংকীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা দোষে দূষিত, সেই সকল নীতিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই সকল নীতিবাদ খণ্ডন করিয়া, এমন একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব, যাহার

যাহা বিশ্বমানবের সহজ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

SERMONS OF MAHARSHI DEVENDRA NATH TAGORE

(TRANSLATED FROM BENGALI,)

The In-dwelling Spirit.

য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ
যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি
এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

"He who dwelleth in and within the soul, whose Image the soul is, who ruleth it from within, and yet it knows Him not, He is the Inner guide (Antaryamin), the Immortal".

What a blessing it is for us that we are able to sanctify our souls by worship of the Holy of holies, in this sacred morning hour.! The holiness, the illumination of the spirit can only come from His worship. He is enthroned for ever in every soul and it is his presence that sanctifies it. Whenever the soul strays away from the Supreme Spirit, it is filled with sorrow ; stricken with grief and decay and consumed by unholy desires. But as we cherish God within our souls, we are purified and sanctified. Where is this Supreme Spirit ? He is not far to seek but is in close contact with every one of us. He is within our souls.

"He who dwelleth in and within the soul and sanctifies it, whose Image the soul is, who ruleth it from within and yet the soul knows Him not, He is the inner guide, the Immortal." This is the saying of one of our ancient Rishis, the inspired utterance of that brave and high-souled Rishi, Yajnavalkya, and we find it in White Yajurveda, Madhyandina Sàkhà. We cannot find God by travelling in distant countries or making arduous pilgrimages. Those who seek Him in the external world come away disappointed. Things of the spirit cannot be seen in a visible form in the outer world. He alone sees Him who looks for Him in the inner sanctuary of the soul. If God had fixed His abode in the highest Heaven, far far away from us, how should we have reached Him there ? But it is not necessary to travel far and wide in order to see Him. Whenever we bring our minds under control and turn our eye inward, calm and undistracted, we see Him enshrined in our innermost souls.

We have not to go far to see Him—who dwelleth within our souls. As however the body has to exert itself in order to go a great distance, so in the act of self-introspection, it is necessary that the mind should strive with energy. Training the mind is a far harder task than mortifying the flesh. Whatever else you may do, the one thing necessary in order to realize God within the soul is self-discipline. One must be calm and serene, patient and self-possessed in order to attain the desired end. We may arrive at a certain destination by walking hundreds of miles, but though the soul is nearest to us of all, yet it is extremely difficult to reach it, after overcoming worldly distractions. Our attention varies according to the strength of our desire. God's presence within the soul cannot be realized without the utmost desire and concentration of the mind. But the task, however difficult, must be accomplished. Why come to the house of worship, if you go away empty-hearted, without seeing God ? If we should fail to realize His presence in our souls, and turn to Him with love and reverence, our object in coming here is wholly frustrated.

What are the attributes of this soul, wherein dwells the Supreme Spirit ? Let us consider the question attentively. We have

it in the Vedas "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণং" That which knows 'I smell this,' that is the soul; the nose is but the instrument of smelling. "অথ যো বেদেদং অভিব্যাহরাণীতি স আত্মা অভিব্যাহারায় বাক্" That which knows 'I speak,' that is the soul; the tongue is but the instrument of speech. "অথ যো বেদেদং শৃণ্বানীতি স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রং" That which knows 'I hear,' that is the soul, the ear is the instrument of hearing. "অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ" that which knows 'I think,' that is the soul, the mind is its divine eye, the internal eye by which it sees. The soul is neither hand nor foot, nor eye nor ear, nor is it the organs of smell or speech. The soul is that which sees with the eye, hears with the ear, grasps with the hand, goes with the foot. When, through meditation, we come to know the soul, we become privileged to see the Supreme Spirit. As we cannot see the master of the house without entering it, so we must go into the chamber of the soul before we can see the Lord, its master. It is from the knowledge of the self, the Ego that we rise to the knowledge of God. Hence it behoves thee, first of all, to know Thyself, the self that sees, feels, hears, thinks, understands. Now on what does this soul rest ? To this question the answer is that the soul rests in the eternal, the Supreme Spirit. "স পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।" When the human soul, feeling itself to be homeless, seeks its life's refuge and calm, tranquil and chastened by discipline, becomes pure and undefiled, then it sees God within and hears his thrilling living Voice "অহং ব্রহ্মাস্মি" 'I am the Brahman in thy soul—Take refuge in Me and thou shalt be free from sin and anguish.' We can not hear that soul-stirring voice, that sweet consoling message with our bodily ear but it can be heard when we are absorbed in contemplation and inspired by spiritual wisdom.

"জিস-নে তু জানায়া সোহি জন জানে
হরিগুণ সদহি আর্থ বাখানে"

'O Lord, he alone knows, to whom thou revealest thyself. And knowing Thee, he sings Thy praises for ever.'

The supreme Spirit dwells within light and darkness, within the sun and moon, but the light and darkness, the sun and moon know Him not. He also dwells in the soul of man and the soul knows Him not, though to it has been vouchsafed the privilege of knowing Him. When by purity of life and spiritual culture, the soul attains to a state in which it is filled with a deep yearning after the Lord, so that it cannot do without Him, to such a pure and devout soul doth the Lord reveal Himself. O seek Him, the in-dwelling spirit, within thy soul and not in the empty space. As blood and breath are the life of the body, so the life of the soul is God. Blessed is he who hath entered into holy communion with this Brahman. Such fellowship, commenced here on earth, never ends. Even though the body lies here forsaken, the soul enters into life everlasting and attains all its desires in union with the Eternal. সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা. Such a union is the crown of our desire, our heaven, our salvation.

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।

"This Supreme Spirit cannot be known by fine speech, nor by keen intelligence, nor much learning. He alone knows who seeks Him with fervent prayer and unswerving devotion. To such a seeker the Lord reveals Himself and all his desires are fulfilled. Oh ! Arise, awake, hie thee to his door with a humble and sincere heart and thy prayer will be answered. The temptations

and fascinations of the world will come to an end; thou shalt have joy to thy right, and enjoyment to thy left; and thy soul shall sing pœans of His love in ecstacy. O! Hearken to His low and solemn voice as dwelling within the finite soul, he utters these words —Aham Brahmàsmi—I AM THE BRAHMAN.

মৃত্যুচিন্তা ও বৈরাগ্য।

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা পাতা বিধাতা। তাঁহার মঙ্গলভাব হইতে আমরা জন্মিয়াছি, তাঁহারই মঙ্গলভাবে আমরা জীবিত রহিয়াছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহারই মঙ্গলভাবে আমরা বিরাম ও বিশ্রাম লাভ করিব। তিনি আমাদের জন্ম-স্থিতি-মৃত্যুর দেবতা। এই জন্ম-স্থিতির ভিতর দিয়া তাঁহার করুণা প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার অবাধ অগাধ প্রীতি বহমান হইতেছে। এতই তাঁহার করুণা, এতই তাঁহার প্রেম— যে, সেই করুণা ও প্রেমের বাহুল্যই আমাদিগকে তাঁহার করুণা ও প্রেম উপলব্ধি করিতে দেয় না। বায়ু-সাগরে আমরা সকলে নিমজ্জিত; আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে বায়ু রহিয়াছে; অথচ একজন নিরক্ষরকে জিজ্ঞাসা কর, সে বহমান স্থির বায়ুর অস্তিত্ব পর্য্যন্তও স্বীকার করিবে না। বায়ুর সত্তা তখনই সে স্বীকার করিবে, যখন প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে আরম্ভ করিবে, তাহার পর্ণকুটীরকে ভূমিসাৎ করিতে উদ্যত হইবে।

ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থের সহিত আমাদের অবিরাম ঘনিষ্ঠতম যোগ, বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটিলে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও মনে প্রতিভাত হয় না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু মাতার সহজ স্নেহে প্রতিপালিত হয়; ক্ষুধা পাইলেই মাতার স্তনদুগ্ধ পান করে; নিদ্রার উপক্রমে মাতার উদার ক্রোড় প্রসারিত দেখে, তাহাকে আয়াস পাইতে হয় না, বাধা ভোগ করিতে হয় না, সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার ন্যায় মাতার অপরিমেয় সহিষ্ণুতা সে চারিদিকে নিরীক্ষণ করে; তাই সে মাতার নিঃস্বার্থ প্রেম সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শিশু মনে করে, মাতার পক্ষে স্নেহ দান করাই স্বাভাবিক, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে জড়ের ন্যায় মাতা স্নেহ দান করিতে বাধ্য, এবং সেই স্নেহ লাভ করিবার পক্ষে যেন শিশুর ন্যায়সঙ্গত একটি অধিকার আছে। মাতৃস্তনের দুগ্ধধারার ভিতর দিয়া যে জননীর হৃদয়বিগলিত প্রেমধারা বিনির্গত হইতেছে, সে তাহা প্রতীতি করিতে পারে না; কিন্তু তখনই সে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে, যখন কালক্রমে সে জ্ঞানেতে উন্নত হয়, অথবা নিজে বয়সের আধিক্যে সংসারে জনক-জননীর স্থান অধিকার করিয়া বসে।

আমাদের জন্মে ও জীবনে ঈশ্বরের যে অপরিমেয় করুণা ও প্রেম, তাহা সহজে আমাদিগকে ঈশ্বরের অভিমুখীন করে না; কিন্তু মৃত্যুর বিভীষিকা অমৃতের সন্ধানের প্রথম পথিপ্রদর্শক। জগতে ভয় বিপদ্ মৃত্যু না থাকিলে বুঝি সহজে কেহ তাঁহার সন্ধান লইতে প্রয়াসী হইত না। একই ধীর স্থির ও প্রশান্ত ভাবে জীবন কাটিতেছে, কোন ঝটিকা নাই, কোন আবর্ত্ত নাই, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ভাব। পরক্ষণে বিরহ-বিচ্ছেদ-বেদনা মৃত্যুর তরঙ্গ উত্থিত হইল। প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। রক্ষা পাইবার জন্য নিজের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না, নিজেকে দুর্ব্বল জানিয়া বাহিরের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ক্রমে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের দিকে কাতর দৃষ্টি পড়িল। জন্মে ও জীবনে তাঁহার যে অপরিমেয় করুণা ও প্রেম ভোগ করিয়াছি, তাহা সেই করুণাময়ী মাতার হস্তকে প্রদর্শন করাইতে পারিল না বটে। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া—ভয়-বিপদ্ আসিয়া আমাদিগকে সচকিত করিল, আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল, উপরের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে ইঙ্গিত করিল।

আমাদিগকে ত জাগিতে হইবেই; কিন্তু কে আমাদিগকে জাগ্রত করিবে? তাঁহার করুণা তাঁহার অযাচিত প্রেম আমাদিগকে জাগাইতে পারে। তিনি আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া শত শত উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু রোগ যতই কঠিন, রোগ-নাশের ঔষধ ততই বলবত্তর হওয়া চাই। আমরা সংসারে নিমগ্ন, মৃত্যু-চিন্তা ভিন্ন কেহই আমাদিগকে সচকিত করিয়া এত সহজে আমাদের চৈতন্যসম্পাদন করিতে পারে না। জীবন অনিত্য, ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেই হইবে, শত সহস্র উপভোগের বিষয় হইতে একদিন বিদায় গ্রহণ করিতেই হইবে, তোমার সৌন্দর্য্য—অতুল্য বৈভব কিছুই থাকিবে না, তোমার এ দেহ একদিন ভস্মসাৎ—ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।—এ চিন্তা সত্যসত্যই বৈরাগ্যের বিজলি হৃদয়ে জ্বালাইয়া দেয়, এ চিন্তাতে অভিমান-অহঙ্কার দূরে পলায়ন করে, ষড়্রিপুর পরাক্রম অচিরে খর্ব্ব হইয়া যায়।

এ দেশে এক সময়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন অগ্নিতে হব্য-কব্য প্রদান করিতেন। সে অগ্নিকে তাঁহারা নির্ব্বাণ হইতে দিতেন না। মৃত্যু হইলে সেই আজন্মপোষিত অগ্নিতেই তাঁহাদের দেহের সৎকার হইত। অগ্নির উপাসক না হইলেও আমরা বলিতে পারি, যিনি দেহান্তকারী অগ্নিকে—মৃত্যুকে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার বাসনা কি ঘৃণিত পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে?

দিল্লীর কোন এক প্রতাপান্বিত মোগল বাদশাহ আপনার চিত্তকে সুশাসিত করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্টিত ছিলেন। মৃত্যুচিন্তা ভিন্ন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি এক সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুখশয্যা হইতে উঠিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার সময়ে রাজদরবারের প্রবেশ পথেই জনৈক দৌবারিক সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—'জাঁহাপানা, কোথায় আপনার কবর খোলা হইবে; দেখাইয়া দিন।' এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া যাইত। অপরিমেয় ভোগ্য-সামগ্রীর ভিতরে সত্যসত্যই মৃত্যুচিন্তার স্থান নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রাতে এইরূপে যে মৃত্যুর বিভীষিকা বাদশাহের মনে সমুদিত হইত, তাহাতে তাঁহার দেহের প্রতি কেশাগ্র দাঁড়াইয়া উঠিত, শরীর কণ্টকিত হইত; ইহা হইতেই তাঁহার দিবসব্যাপী রাজকার্য্যের প্রতি-আদেশে অহঙ্কার ঔদ্ধত্য গর্ব্ব ও অত্যাচারের লেশমাত্র থাকিত না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি এক সময়ে কাশ্মীরভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত জনৈক মুসলমান সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। ঐ সন্ন্যাসীর সহিত মহর্ষির আলাপ হইলে সন্ন্যাসী মহর্ষিকে সঙ্গে লইয়া অদূরে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্তের নিকটে গিয়া কহিলেন, আমি প্রতিদিন এক কোদাল করিয়া মাটি তুলিয়া এই গহ্বর খুলিতেছি; আমার কবরস্থান নিজেই খনন করিয়া যাইতেছি, এইখানেই আমার মৃতদেহের সমাধি হইবে। নৃশংস

মৃত্যুর সঙ্গে কি আশ্চর্য্য আত্মীয়তা স্থাপন! মহর্ষি তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

আমরা ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য পরমদেবের উপাসক। আমরা কেবল স্রষ্টা পাতা বিধাতা দেবের উপাসক নহি, আমরা মৃত্যুর দেবতার—সংহর্ত্তারও উপাসক। সেই সংহর্ত্তাকে কোন দেশে কোন জাতি প্রীতি-কৃতজ্ঞতার বিমল অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারে নাই; কিন্তু এই আর্য্যজাতিই সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের দেবতার সহিত মৃত্যুর দেবতার একত্ব স্থাপন করিয়া ওঙ্কাররবে তাঁহার সিংহাসন যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতেছে। তাঁহারা জ্ঞানযোগে জানিয়াছিলেন—পরব্রহ্মের আনন্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি, তাঁহার আনন্দেই জগতের স্থিতি, প্রয়াণকালে—মৃত্যুসময়ে তাঁহারই আনন্দে আমাদের গতি।—ইহা অমোঘ ঋষিবাক্য। সত্যসত্যই মৃত্যুতে বিষাদ নাই, ক্রন্দন নাই, নিরাশা নাই, হাহুতাশ নাই, তাঁহারই আনন্দধামে প্রবেশ—তাঁহারই আনন্দরাজ্যে চির-বসতি। এই মৃত্যুই আমাদিগকে অমৃতের সম্বল আনিয়া দিক্, আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুক্, আমাদের ধর্ম্মজীবনকে বিগঠিত করুক, ঈশ্বরের বিমল জ্যোতি দেখাইয়া দিক্। মৃত্যুচিন্তাই আমাদিগকে আশান্বিত করুক্, আমাদের দিব্যচক্ষু [illegible]ইয়া দিক্। হে প্রণবের দেবতা! তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও; মৃত্যুর ভাব দেখাইয়া আমাদিগকে অমৃতে আকর্ষণ কর, বৈরাগ্যভাব অন্তরে বিকাশিত কর। ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

নানা কথা।

হিন্দুধর্ম্ম।—যিশুখৃষ্টপ্রচারিত ধর্ম্ম-মতই বাইবেলের সর্ব্বস্ব। মোহামম্মদের মতামত হইতেই মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি। খৃষ্ট ও মোহাম্মদ, খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মের মূলে; কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিভিন্ন সময়ে কত অসংখ্য লোকের উপদেশ লইয়া হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত, সুমার্জ্জিত ও বিগঠিত। প্রকৃতির বৈচিত্র্যে তত্ত্বান্বেষীর বিস্ময়াভিভূত হৃদয়ে এই ধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত। প্রকৃতির অন্তরালে যে গুপ্ত-শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার সন্ধানে এধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তন। বৈদিক স্তুতিগুলি তিন হাজার বৎসরের বহুপূর্ব্বে গীয়মান ও রচিত। খৃঃ পূঃ সহস্র বৎসর হইতে খৃঃ পূঃ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া উপনিষদের প্রভাবকাল; দর্শনের কাল খৃঃপূঃ ৫০০ বৎসর হইতে খৃষ্টাব্দ ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত। তাহার পর বিভিন্ন সংগ্রাহককর্ত্তৃক পৌরাণিক যুগের প্রবর্ত্তন। অষ্টমশতাব্দীতে শৈবদলের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে উদয়ন ও রামানুজের উৎপত্তি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের জন্ম; এবং উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহনরায়ের উৎপত্তি। হিন্দুধর্ম্ম কি, ও তাহার নিকট কি পাওয়া যাইতে পারে, তাহা জানিতে হইলে এই বিভিন্ন স্তরের মতবাদগুলির আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। Calcutta University magazine July.

বৌদ্ধবিরোধ।—উদয়নাচার্য্য একাদশশতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধগণের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিয়া দেন; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাই তাঁহার উদ্দেশ্য; বৌদ্ধমত নির্ব্বাসিত করাই তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধগণকে প্রায়ই পরাভব করিতেন; কিন্তু তথাপি বৌদ্ধেরা নিজ পরাজয় স্বীকার করিত না। কথিত আছে, একদিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বৌদ্ধগণকে ঈশ্বরের অস্তিত্বস্বীকারে পশ্চাৎপদ দেখিয়া তিনি একজন বৌদ্ধ ও আর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন; এবং তাহাদের উভয়কেই পর্ব্বত হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ 'ঈশ্বর আছেন' এই বলিতে বলিতে অক্ষতশরীরে ভূমিতে আসিয়া পড়িল; আর বৌদ্ধ 'ঈশ্বর নাই' বলিতে বলিতে ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল বটে, কিন্তু লোকে নরহন্তা বলিয়া উদয়নাচার্য্যের কুৎসা করিতে লাগিল; ইহাতে উদয়নাচার্য্য বিশেষ সন্তপ্ত হইয়া পুরীধামে গমন করেন এবং তথা হইতে বারাণসীতে আসিয়া [illegible]নলে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেন।

The same pap[illegible].

ভাষা।—পৃথিবীস্থ জনসংখ্যার ভিতরে প্রতি-শতে ২৭ জন ইংরাজি-ভাষায় কথোপকথন করে, এবং ১৬ জন জর্ম্মাণ-ভাষায়, চৌদ্দজন চীন-ভাষায়, প্রায় চৌদ্দ জন ফরাসি-ভাষায় কথা-বার্ত্তা করিয়া থাকে। চীনদেশের জনসংখ্যা যথার্থরূপে পরিগৃহীত হইলে, চীন-ভাষা বোধ হয় এইবার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

Review of Reviews June. p-599

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৪৩৲
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৭৩৮॥৶০
সমষ্টি	...	৩১৮১॥৶০
ব্যয়	...	৪১৯।/৩
স্থিত	...	২৭৬২। ৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
১৬২।৯

২৭৬২।৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫০।০
পুস্তকালয়	...	৪/০
যন্ত্রালয়	...	১৮৪৸৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৩৸০
সমষ্টি	...	৪৪৩৲

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৪৯॥০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪০।/৩
পুস্তকালয়	...	৫৫॥৩
যন্ত্রালয়	...	১৬৫৶৯
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৮৸০
সমষ্টি	...	৪১৯।/৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	...	২৲
শ্রীমতী হেমলতা দেবী	...	২৲
শ্রীমতী সুকেশী দেবী	...	২৲
শ্রীমতী ধীরবালা দেবী	...	২৲
শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	...	২৲

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলন।

মুখ্য বেদান্ত উপনিষদ্, তদর্থ-নির্ণায়ক গৌণ বেদান্ত ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থকে আমরা বেদন্তদর্শন বলিয়া ব্যবহার করি। বেদান্তদর্শন সর্ব্বপরিচিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র সমাদৃত। পূর্ব্বকালে যে সকল মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অভিহিত দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং উক্ত দর্শনকে সুগম করিবার জন্য নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই দর্শনের বিষয়বিভাগে যে কত গ্রন্থ আছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য এতদ্দর্শনোক্ত পথের প্রধান পথিক। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ব্যাস-মহর্ষির সূত্রভাগ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতমত প্রচার করেন। সেই জন্য তৎসম্বলিত বেদান্তদর্শনকে কেহ কেহ শাঙ্করদর্শন বলিয়াও উল্লেখ করেন, এবং অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায় অদ্বৈতদর্শনও বলিয়া থাকেন।

এই বেদান্তশাস্ত্র—তিন প্রস্থানে, অর্থাৎ তিন মহাবিভাগে বিভক্ত। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়। উপনিষদগুলি শ্রুতিপ্রস্থান, গীতা প্রভৃতি স্মৃতিপ্রস্থান এবং ব্যাসকৃত শারীরকসূত্র ন্যায়প্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূজ্যপাদ শঙ্কর এই তিন বিভাগেরই ব্রহ্মাদ্বৈত-প্রতিপাদক মহাভাষ্য রচনা করিয়া কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষিবেদব্যাস-কৃত বেদান্তসূত্রগুলি সর্ব্বতোমুখ। উহাকে যিনি যে ভাবে দেখেন, তাঁহার নিকট সেই ভাবেরই অর্থ স্ফুরিত হয়। উহার ব্যাখ্যা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় প্রকারেই প্রকাশ করা যাইতে পারে। সেইজন্য এই দর্শনের অনেকগুলি অবান্তর প্রস্থান প্রচারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সূত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যানুসারে রামানুজপ্রস্থান এবং মধ্বাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যানুসারে মাধ্বপ্রস্থান ইত্যাদি।

অধ্যায়বিভাগাদি।

অভিহিত দর্শনের অধ্যায়বিভাগাদি এইরূপ—বেদান্তসূত্রের গ্রন্থ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায় চারি চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি, দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে

অস্ফুটার্থ শ্রুতিসমূহের ব্রহ্মবোধকতানিশ্চয়, চতুর্থে সাংখ্যাভিমত প্রধান-পদার্থের (প্রকৃতির) সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব প্রভৃতি বিচারদ্বারা দর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে সন্দিগ্ধার্থ শ্রুতিস্মৃতির ব্রহ্মপরতা নির্ণয়, দ্বিতীয়পাদে শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমত নিরাস, তৃতীয়পাদে সৃষ্টিক্রমপ্রসঙ্গে আকাশের জন্যত্বস্থাপন, এবং চতুর্থপাদে প্রাণতত্ত্ব প্রভৃতি অভিহিত হইয়াছে।

তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদে জীবের সংসারগতির ক্রম, দ্বিতীয়পাদে জগতের অবস্থাভেদাদি, তৃতীয়পাদে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারাদি, এবং চতুর্থপাদে বেদান্তসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের মুক্তিপ্রয়োজকতা প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদে সাধনবিচার, দ্বিতীয়পাদে প্রাণনির্গমাদি, অর্থাৎ মৃত্যুবিষয়ক বর্ণনা, তৃতীয়পাদে দেবযান-পিতৃযান প্রভৃতি পারলৌকিক পথের বিচার, এবং চতুর্থপাদে মুচ্যমান জীবের পরজ্যোতিঃপ্রাপ্তিপ্রকারাদি অভিহিত হইয়াছে। এই সকল অধ্যায় ও পাদে প্রসঙ্গাগত অনেক তত্ত্বকথা ও রহস্যবিষয় দর্শিত হইয়াছে।

অধিকারি-নির্ব্বাচন।

বেদান্তদর্শনের প্রধানপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। এই দর্শনের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্যপদার্থ, আর সব মিথ্যা। ব্রহ্মতত্ত্ব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও দুঃখসম্পর্কের অতীত হওয়া যায়। এইসকল বিষয় বেদান্তদর্শন উত্তমরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরন্তু মনুষ্যসাধারণ, এই পথের পথিক হইতে পারে না, কোন বিশেষ অবস্থাপন্ন মনুষ্য এই পথের পথিক হওয়ার উপযুক্ত পাত্র। সেই উপযুক্তপাত্র অধিকারী বলিয়া এতদ্দর্শনে অভিহিত হয়। অধিকারী ব্যক্তি বেদান্তমতের অনুসরণ করিলে মুক্ত হইতে পারে বটে, পরন্তু অনধিকারী ব্যক্তি সহসা এই পথে পদার্পণ করিলে ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া পড়ে। সেই জন্য অগ্রে আপনাতে জ্ঞানলাভোপযোগী সামর্থ্য উৎপাদন করা আবশ্যক। অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র বা অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

বেদান্তাচার্য্যেরা বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার লাভ করা সহজসাধ্য নহে। তজ্জন্য অগ্রে অনেক কার্য্য করিতে হয়। অধ্যয়নবিধির বশে থাকিয়া প্রথমতঃ বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিতে হয়, স্থূলতঃ সে সকলের অর্থ হৃদ্গত করিতে হয়, কামনাপরিত্যাগী হইয়া শাস্ত্রোক্ত নিত্যকর্ম্মে রত থাকিতে হয়, এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত উপনিষদ্শাস্ত্রোক্ত উপাসনানিষ্ঠ হইয়া থাকিতে হয়। পরে যখন দেখিবেক, চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, রাগদ্বেষাদি মনোমল অপগত হইয়াছে বা উন্মার্জিত হইয়াছে, তখন চারি প্রকার সাধন অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম জানিবার জন্য সচেষ্ট হইবেক। চারি প্রকার সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভে অধিকারী হওয়া যায়, এবং অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা করিলে, সে ইচ্ছা অচিরাৎ ফলপ্রদা হইয়া থাকে, নচেৎ অনধিকারীর ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা আর দরিদ্রের রাজ্যলাভেচ্ছা সমান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

সাধনচতুষ্টয়।

বলা হইল—চারি প্রকার সাধনে সিদ্ধ, অর্থাৎ অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। তাহা কি কি? বলা যাইতেছে।

১। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক।

১। ঐহিক পারত্রিক ভোগে বৈরাগ্য।

১। শমদম প্রভৃতি ছয়প্রকার সাধনে অভ্যস্ত হওয়া।

১। মুক্তীচ্ছা, অর্থাৎ সংসারবন্ধনছেদনের বলবতী ইচ্ছা।

প্রথম সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, ইহসংসারে কোন্ বস্তু নিত্য ও কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহা চিন্তাসহকৃত বিচারদ্বারা জানা ও স্থিরকরা। অবশেষে ইহাই স্থির করা যে, একমাত্র ব্রহ্ম নিত্য, আর সব অনিত্য। দ্বিতীয় সাধনের কথা এই যে, কি ইহলোকের বৈষয়িক স্থান, কি ভবিষ্যৎ পরলোকের স্বর্গাদিস্থান, কোনও স্থলে আমার প্রয়োজন নাই। সমস্তই নশ্বর, সমস্তই অলীক, সমস্তই কল্পনা মাত্র। তৃতীয় সাধনের বিবরণে ছয় প্রকার অনুষ্ঠান লক্ষ হয়, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। অর্থাৎ ব্রহ্মশাস্ত্রাতিরিক্ত শাস্ত্রশ্রবণে বিরত হওয়া, জ্ঞানানুকূল বিষয় ব্যতীত বিষয়ান্তরে ধাবমান মনকে ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাবৃত্ত করা, জ্ঞানবিরোধ কার্য্যানুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, মানাপমান সুখদুঃখ ও শীতোষ্ণ প্রভৃতি সহ্য করিবার সামর্থ্য উৎপাদন করা, ও চিত্তকে সদা ব্রহ্মতত্ত্বে ও তদনুকূল বিষয়ে নিবিষ্ট রাখা, গুরুবাক্য ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বস্ত হওয়া ও আমি সংসারে মুক্ত হইবই, এতদ্রূপ দৃঢ় ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হওয়া।

উল্লিখিত প্রকার অধিকারী বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্ম লাভের জন্য উদ্‌যুক্ত হইলে তাহারই উদ্‌যোগ সফল হইবেই হইবে, ইহা বেদান্তাচার্য্যদিগের দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

গুরূপসর্পণ।

অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ গুরূপসর্পণ করা কর্ত্তব্য। গুরু তাদৃশ অধিকারী শিষ্য প্রাপ্ত হইলে তাহাকে প্রধানতঃ অধ্যারোপ-যুক্তি ও অপবাদ-যুক্তি অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন,—এ বিধি, অর্থাৎ এই শাস্ত্রের আদেশ গুরুর প্রতি বিদ্যমান রহিয়াছে। গুরু তাহার অন্যথা করিবেন না।

উপদেশাধিকারী গুরুর কথা।

অনধিকারী শিষ্য যেমন ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত হয়, তেমনি অনধিকারী গুরুও শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞ করিতে অপারগ হন। কিরূপ গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞ করিতে পারেন, ব্রহ্ম বুঝাইতে পারেন, তাহাতে বেদান্তশাস্ত্রে 'শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্' ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদবেদান্তাদিশাস্ত্রপারগ ও নিজে ব্রহ্মজ্ঞ এরূপ গুরুই শিষ্যে আপনার ব্রহ্মজ্ঞতা সংক্রামিত করিতে পারেন, অন্য গুরু তাহা পারেন না। শাস্ত্র জানেন না, বুঝাইবার উপযুক্ত বিবিধ উদাহরণ কথা জানেন না, অথচ ব্রহ্মজ্ঞ, এরূপ গুরুর দ্বারা বোধনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় না। শাস্ত্র জানেন, অনেক প্রকার দৃষ্টান্ত কথা জানেন, অথচ নিজে ব্রহ্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বা সন্দিহান, এরূপ গুরুর দ্বারাও বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গল্প আছে। গল্পটী এই—

মরুদেশবাসী এক অধ্যাপক এক শিষ্যকে অমরসিংহকৃত কোষগ্রন্থ পড়াইতেছিলেন। অমরকোষের যে স্থানে নারিকেলগাছের নাম লিঙ্গাদি বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানটা পড়ান হইলে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—নারিকেল গাছ কিরূপ?' প্রশ্ন শুনিয়া অধ্যাপক হতজ্ঞান হইলেন, তিনি কখন নারিকেল গাছ দেখেন নাই, কেবল এইমাত্র শুনিয়াছিলেন যে, নারিকেল গাছ পূর্ব্বদেশে জন্মে। আমি কখন নারিকেল গাছ দেখি নাই, নারিকেল গাছ কিরূপ

তাহা জানি না, এ কথা বলিলে শিষ্যের নিকট হতমান হইতে হয়; সুতরাং যেন তেন প্রকারেণ শিষ্যকে একটা কিছু বলিয়া বুঝান আবশ্যক, ইহা মনে করিয়া বলিলেন, 'স তু প্রাগ্‌দেশীয়লতাবিশেষঃ।' অতএব, শাস্ত্রজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান উভয়জ্ঞান না থাকিলে শিষ্যবোধনকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাই বেদান্তের কথা 'তং গুরুমভিরয়েৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' সংসারানলপ্রতপ্ত অধিকারী ব্যক্তি বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া বেদান্তাদিশাস্ত্র পারগ ও ব্রহ্মস্থ এরূপ গুরুর নিকট গিয়া তৎসকাশে ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিবেন। গুরুও অধ্যারোপ ও অপবাদ ও তন্মধ্যের যুক্তির অনুগামী হইয়া শিষ্যকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ করিতে থাকিবেন।

অধ্যারোপ কথার অর্থ—যে ক্রমে এই ভ্রমদৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এবং অপবাদকথার অর্থ—যে ক্রমে এই ভ্রমসৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা। এতদ্ভিন্ন, আরও অনেক যুক্তিযুক্ত উদাহরণাদি ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপাদনার্থ অবলম্বনীয়।

ব্রহ্মলক্ষণ নির্দ্দেশের কথা।

কোন কিছু বুঝাইতে হইলে, তাহার লক্ষণ বলিতে হয়। লক্ষণ বলিলেই শ্রোতা তদনুসারে বস্তু চিনিয়া লইতে পারে। এ নিয়ম ব্রহ্মোপদেশেও অবিচাল্য। অর্থাৎ ব্রহ্মোপদেশ করিতে হইলে, প্রথমে ব্রহ্মের লক্ষণ কি, বলা আবশ্যক। শাস্ত্রে লেখা আছে, ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য দুই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এক প্রকারের নাম স্বরূপলক্ষণ, অন্য প্রকারের নাম তটস্থলক্ষণ, যে সকল বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্ম বুঝান হইবে, সে সকল যদি ব্রহ্মের অনতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে সে লক্ষণ স্বরূপলক্ষণ বলিয়া ধার্য্য। আর বিশেষণ গুলি লক্ষ্যভূত বস্তুর স্বরূপাতিরিক্ত হইলে, সে লক্ষণ তটস্থ বলিয়া ধার্য্য। ইহার বিবরণ পরবর্ত্তী প্রবন্ধে প্রকাশ্য।

ক্রমশঃ—

সখা।

যৌবনে দৈহিকপ্রকৃতির ক্রমপুষ্টি ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিরও ক্রমপুষ্টি ও ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে।

বুভুক্ষুব্যক্তি যেমন 'সব খা'ব' বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করে, এবং যেমন যেমন পায়, তেমন তেমন খাইতে থাকে, সেইরূপ যৌবনে প্রথম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বুদ্ধিও 'সব ভোগ করিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করে এবং বিষয় যেমন যেমন উপস্থিত হইতে থাকে, তেমন তেমন উপভোগ করিতে থাকে।

যুবক যে সে কর্ম্ম করিতে ধাবিত হয় বটে, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে কে যেন নিষেধ করিয়া উঠে—'না, এ কাজ করিতে নাই।' আবার আর একটি কাজ করিবে না বলিয়া ঠিক করিলে, ভিতর হইতে কে যেন বলিতে থাকে—'সে কি! তোমাকে এইটি যে করিতেই হইবে।' এইরূপে যুবক নিজের আত্মা ভিন্ন, অন্তরের আর একজন দেবতার অস্তিত্ববিষয়ে অসন্দিগ্ধ হইয়া উঠে এবং সেই অন্তরের দেবতাকে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক, যুবকের ব্যস্ত হইবার বিশেষ কারণও আছে। যুবক দেখে যে, অন্তরের দেবতা কিছুই খান না ছোঁন না, অথচ সময়মত ভালমন্দ বুঝাইয়া দিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত। সে দেখে সদ্বৃত্তির গুরু-

গভীর প্রেরণা,—সৎ-প্রবৃত্তির উত্তেজনা, মন্দ-প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; তখন যুবকাত্মা মহা একটা দোটানার মধ্যে পড়িয়া যায়,—কি করি, ভাল করি, কি মন্দই করি। এই সময়ে সেই অন্তরের দেবতা সেই দোটানার মধ্যে আসিয়া এবং মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দেন। সদ্বৃত্তির তীব্র উত্তেজনা অসদ্বৃত্তির উত্তেজনাকে তিরস্কার করিয়া থামাইয়া দেন। যুবকাত্মা সেই অন্তরের দেবতার ইঙ্গিত পাইয়া, সৎ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এবং ভাবসংগ্রামের শান্তিকারী এই অন্তরের দেবতার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য হয়; এবং সেই অন্তরের দেবতা যে কি উপাদানের বস্তু, তিনি যে কেন অকারণ এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, তাঁহার চরণে বাঁধিয়া রাখিতে চান, কেন যে সেই মঙ্গলভাবের অহৈতুক বিকাশ হয়, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ফলতঃ যুবকাত্মা ব্যস্ত না হইয়া পারে না। যিনি অকারণ বন্ধু, সন্দেহ সময়ে সুনিশ্চিত পথপ্রদর্শক, সাধু কার্য্যের সহায় ও উৎসাহদাতা, যাঁহার অধীন না হইয়া থাকিলে, জীবনে শান্তি নাই, সেই অকারণসখার পরিচয় পাইতে যত্ন ও চেষ্টা না করিয়া যুবকাত্মা সুস্থই হইতে পারে না। এই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন;—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

'এক সহযোগী সুপক্ষ দুইটি সখা একটী সমান বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু সেই দুইয়ের মধ্যে অন্যতর একটি পক্ষী স্বাদুফল ভোগ করিতেছে, আর অন্যতর একটি পক্ষী স্বাদুফল ভোগ না করিয়াও (অন্যতর পক্ষীর ভোগের জন্য) অভিব্যঞ্জিত করিতেছে মাত্র।'

জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইটিই সুন্দর পক্ষী; পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। নাইবা সুন্দর হইবে কেন? উপনিষদ্ (মুণ্ডক) বলেন;—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ,
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ,
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥"

'যেমন সুদীপ্ত বহ্নিমণ্ডল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত স্ফুলিঙ্গ, সুদীপ্ত বহ্নির সমানরূপেই বিচ্ছুরিত হয়; হে সৌম্যদর্শন! সেইরূপে অক্ষর পরমপিতা হইতে সেই পরমপিতারই অনুরূপ নানাপ্রকার ভাব সকল—জীব সকল প্রজাত হয়, এবং তাঁহাতেই যাইয়া বিলীন হয়—মিশিয়া যা' তাই হইয়া যায়।'

সুতরাং সুদীপ্ত বহ্নিমণ্ডলের আভাই ত স্ফুলিঙ্গের আভা; পরমপিতার অনন্তরশোভন ক্ষুদ্রাংশ জীবাত্মাই বা তবে কেন সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত না হইবে? জীবাত্মা-ত তাঁহার অন্তরতম পরমাত্মার—পরমপিতার সহিত বিচ্যুত অবস্থায় নাই, সর্ব্বদাই একই স্থানে একই সঙ্গে অবস্থিত ও যুক্তই আছেন; তাঁহাদিগের মধ্যে আকাশেরও স্বল্প ব্যবধান নাই; তাঁহারা উভয়েই এই শরীরে সখ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, উভয়েই উভয়ের সখা। পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিতভাবে সম্বদ্ধ; আশ্রয় হইতেছেন পরমাত্মা পরমপিতা, আশ্রিত হইতেছে জীবাত্মা যুবকাত্মা। পরমাত্মা পরমপিতা আশ্রিতবৎসল, প্রেম দান করিয়া পালন করিতেছেন; জগৎপ্রাণ পরমাত্মা প্রাণরূপে মৃত জগৎকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছেন, বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, জীবাত্মা—সঙ্কীর্ণপ্রাণ—যুবকাত্মা প্রাণবায়ুর আশ্রয়ে থাকিয়া বাঁচিয়া আছে,